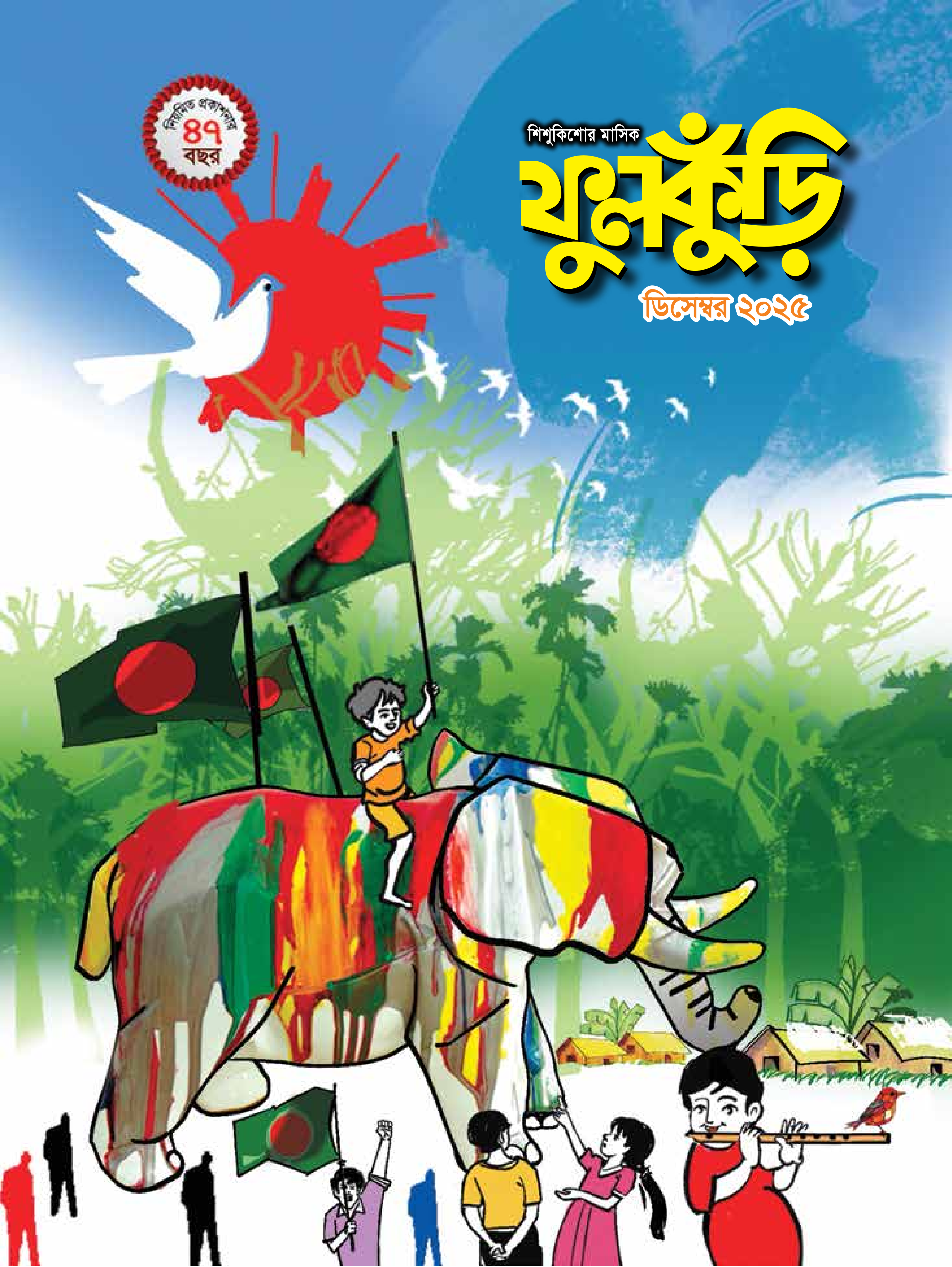
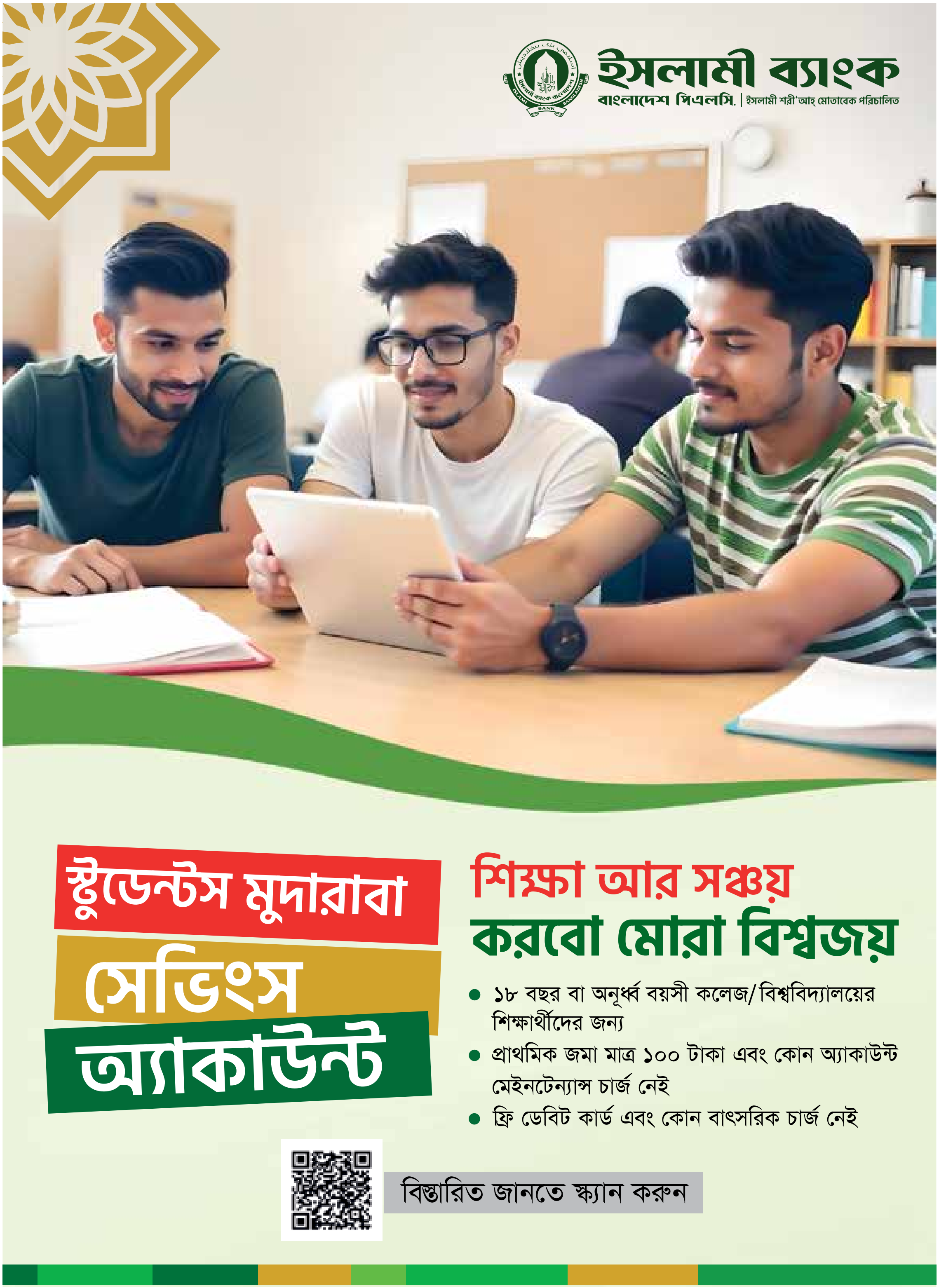


শিশুকিশোর মাসিক
ফুলকুঁড়ি
ডিসেম্বর ২০২৫
নিয়মিত প্রকাশনার
৪৭
বছর



ইসলামী ব্যাংক
বাংলাদেশ পিএলসি. | ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত
স্টুডেন্টস মুদারাবা
সেভিংস
অ্যাকাউন্ট
শিক্ষা আর সঞ্চয়
করবো মোরা বিশ্বজয়
● ১৮ বছর বা অনূর্ধ্ব বয়সী কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য
● প্রাথমিক জমা মাত্র ১০০ টাকা এবং কোন অ্যাকাউন্ট মেইনটেন্যান্স চার্জ নেই
● ফ্রি ডেবিট কার্ড এবং কোন বাৎসরিক চার্জ নেই
বিস্তারিত জানতে স্ক্যান করুন

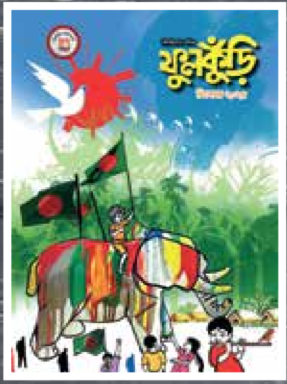
সূচি

শিশুকিশোর মাসিক
ফুলকুঁড়ি
বর্ষ ৪৭, সংখ্যা ১০
ডিসেম্বর ২০২৫
অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪৩২
জমাদিউস সানি-রজব ১৪৪৭

যোগাযোগ : ফুলকুঁড়ি ১১৩/১ সিদ্ধেশ্বরী সার্কুলার রোড, মৌচাক, ঢাকা-১২১৭।
মোবাইল : ০১৯৩৩ ৭০০ ৪০০, সার্কুলেশন : ০১৯৭৭ ৭০০ ৪০৫
তামান্না-ই-জাহান কর্তৃক ৯৪/১ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫ থেকে প্রকাশিত এবং আধুনিক প্রেস ২৫ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত।
ইমেইল : monthlyphulkuri@gmail.com **ফেসবুক :** fb.com/monthlyphulkuri
ওয়েবসাইট : www.monthlyphulkuri.com

মূল্য : ৪০ টাকা

সম্পাদকের চিঠি



প্রিয় বন্ধুরা,
আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছো নিশ্চয়ই। ডিসেম্বর মাসটা অনেকগুলো উৎসবের বার্তা নিয়ে আমাদের মাঝে আসে। তার একটি হচ্ছে শীতের বার্তা। যেখানে থাকে নানান স্বাদের ধোঁয়া ওঠা সুস্বাদু পিঠাপুলির সৌরভ। অতিথি পাখিদের কলকাকলিতে মুখরিত বিল ঝিল নদী জলাভূমির বার্তাও পাই এই ডিসেম্বরে। ডিসেম্বরে থাকে পরীক্ষা শেষ হবার পরে প্রিয়জনদের কাছে বেড়াতে যাওয়ার বার্তা। এই ডিসেম্বরে উদযাপিত হয় বিজয় দিবস। নয়টি মাসের যুদ্ধ শেষে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর গৌরবের উৎসব হয় এই মাসে।

তবু ডিসেম্বর এলেই হৃদয়টা কেমন চিনচিন করে ওঠে। মনে হয়, কালের গর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে আরও একটি বছর। আমাদের জীবন থেকে ফুরিয়ে গেল আরো দীর্ঘ কতগুলো দিন, মাস। কী করেছি এই এক বছরে? সময়টা কি সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পেরেছি? অর্পিত দায়িত্ব কি সঠিকভাবে পালন হয়েছে? বছরের শেষ সূর্যটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অশ্রুসিক্ত হয় তাই আঁখি। ফেলে আসা দিনগুলোর সঠিক পর্যালোচনাই মূলত সামনে এগোবার পথকে মসৃণ করতে পারে।

২৪ গিয়েছে রক্ত আর বিপ্লবে। ২৫-এ নানাবিধ বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের দোলাচলে দুলতে দুলতে কিছুটা স্থিতিশীল হয়েছে দেশ। ২৬ অপেক্ষা করছে একটি অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের। যে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একটি সুন্দর সরকার দেশ পরিচালনার জন্য আসবে। দেশে ফিরবে সুখ শান্তি। সমৃদ্ধি পথে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ।

বার্ষিক পরীক্ষায় সবাই অনেক ভাল ফলাফল করবে, সেই প্রত্যাশা রেখে আজকের চিঠি এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।

স্বাধীনতা তুমি স্বাধীনতা

আবদুল হাই শিকদার



নিবিড় নদীর ধারা বয়ে যেতে যেতে
টেনেছিলো তোমাকে কাছে
মাটির অন্তর থেকে ফুটে ওঠা প্রাণ
ধানের সবুজ আশীষ
বারবার ডেকেছে তোমাকে
পাখির প্রতিটি ডানা জনপদে উড়ে
ছড়িয়েছে তোমার খবর

স্বাধীনতা তুমি স্বাধীনতা

ক্ষেতের কিনারে চাষি গালে হাত দিয়ে
বসেছিলো একা একা
তোমার জন্য বুলেটে গোলাপে
কত কী যে মাখামাখি

কবিতার সব শব্দে শব্দে কালবৈশাখি ঝড়
গানের পৃথিবী সঙ্গীন হাতে
যুদ্ধের মহাকাব্য
প্রতি ঘরে ঘরে আকুল ব্যাকুল রক্তেরা টগবগ

স্বাধীনতা তুমি স্বাধীনতা

আসে আহ্বান যুদ্ধের ডাক
ঈশা খাঁ কালুরঘাটে
আসে আহ্বান যুদ্ধের ডাক
শরীয়তুল্লাহ জাগে
কত যে কাহিনি তিতুর বাহিনী
টেকনাফ তেঁতুলিয়া
পাললিক মাটি ইস্পাত হয়ে ওঠে

স্বাধীনতা তুমি স্বাধীনতা

তুমি তো আমার বুকের মধ্যে আলোকের ফুলঝুরি
তুমি তো আমার হাসন লালন পাগলা কানাই নদী
তুমি তো আমার ধানের কবিতা মেঘনার পেলবতা

স্বাধীনতা তুমি স্বাধীনতা



প্রবন্ধ

বিনয় বিজয়কে করে মহিমান্বিত

নাঈম আল ইসলাম মাহিন

ডিসেম্বর মাস আমাদের বিজয়ের মাস। বিজয় শব্দটি শুনলেই মনে উদ্দীপনা, গর্ব আর সাফল্যের ছবি ভেসে ওঠে। কিন্তু বিজয় কেবল শক্তির প্রদর্শন বা প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার নাম নয়; যথার্থ বিজয় হলো, সেই শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে বিনয়ী হওয়ার মধ্যে। বিজয় মানুষকে যেমন উঁচুতে তোলে, তেমনই বিজয়ের সফলতা ভুল পথে ব্যবহার করলে তা তাকে ধ্বংসের দিকেও ঠেলে দেয়। সত্যিকার অর্থে বিজয়ী জাতি হলো সেই জাতি, যারা শক্তি অর্জনের পর অহংকারে অন্ধ না হয়ে বিনীত থাকে এবং সামনের পথ আরও উন্মুক্ত করে উচ্চতর উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়।

বিজয়ের ভুল ব্যবহার :

পৃথিবীর ইতিহাসে বহু জাতি, শক্তি অর্জনের পর তা ভুলভাবে ব্যবহার করেছে। বিজয়ের পরে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে তারা বিজিতদের ওপর চালিয়েছে চরম নির্যাতন। চাপিয়ে দিয়েছে জুলুম নিপীড়ন আর দাসত্ব ।

এক. বিজিত জাতির প্রতি রোমানদের কঠোর নীতি

রোমান সাম্রাজ্য ছিলো পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী এবং বিস্তৃত সাম্রাজ্যগুলোর একটি। ইউরোপ-এশিয়া-আফ্রিকার বিশাল ভূখণ্ড দখল করে শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল তারা। কিন্তু তাদের অনেক যুদ্ধ ছিল নির্মম। পরাজিতদের দাস বানানো, জোরপূর্বক কর আদায়, শাসনের নামে শোষণ, নিপীড়নের নিত্যনতুন কৌশল উদ্ভাবন এসবই রোমকে ধীরে ধীরে ক্ষয় করে দেয়। শক্তি থাকা সত্ত্বেও বিনয় না থাকায় তাদের সাম্রাজ্য টিকে থাকতে পারেনি।

দুই. চেঙ্গিস খান ও হালাকু খানের নৃশংসতা

চেঙ্গিস খাঁ ইতিহাসের অন্যতম শক্তিশালী একজন বিজেতা। তাঁর সেনাবাহিনী এশিয়া থেকে ইউরোপ পর্যন্ত একের পর এক অঞ্চল জয় করেছে। কিন্তু সেই বিজয়ের সঙ্গে ছিল আগুন-রক্ত ও ধ্বংসযজ্ঞের ইতিহাস। বহু শহর পুড়িয়ে ফেলা, লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করা, পুরো জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার মতো ঘটনা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। ১২৫৮ সালে চেঙ্গিস খানের নাতি হালাকু খান বাগদাদ আক্রমণ করেন। খলিফা আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করার পর, মঙ্গোলরা শহরটি অবরোধ করে এবং ১২ দিন পর এটি দখল করে নেয়। এরপর তারা শহরজুড়ে নৃশংস ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। পৃথিবীর বিখ্যাত গ্রন্থাগার বাইতুল হিকমা ধ্বংস করে জ্ঞান বিজ্ঞানের লক্ষ

লক্ষ বই পুড়িয়ে ফেলে। খলিফাসহ অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে। বাগদাদ পরিণত হয় এক ধ্বংস নগরীতে। শক্তির অপব্যবহারই শেষ পর্যন্ত মঙ্গোল সাম্রাজ্যকে বিভক্ত ও দুর্বল করে দেয়।

তিন. বাংলাদেশের ইতিহাস

আমাদের বাংলাদেশেও এরকম ঘটনা অন্তত দুই দুইবার ঘটেছে। একটি ১৯৭২ থেকে ৭৫, অন্যটি ২০০৮ সাল থেকে ২০২৪ সাল। এসময় জাতির মধ্যে তৈরি হয় দ্বিধা বিভক্তি। প্রতিশোধ স্পৃহা নিয়ে শত শত মানুষকে হত্যা করে এক কালো শক্তি। গুম করে, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়, সম্পদ লুণ্ঠন করে এবং মানবাধিকার বিনষ্ট করে। দুইবারই এই শক্তিটি চরমভাবে ঘৃণিত এবং পতিত হয়।
তারমানে ইতিহাসের পাঠ হচ্ছে, বিজয় শক্তি দেয় ঠিকই, কিন্তু সেই শক্তির ভুল ব্যবহার বিজয়ীদের পতনের দিকে নিয়ে যায়।

বিজয়ের সঠিক ব্যবহার : ক্ষমা, উদারতা ও মহত্ত্ব

ইতিহাসের সব বিজয়ীই যে এমন আচরণ করেছেন তেমনটা নয়। অনেক বিজয়ী নেতা ও জাতি পরাজিতদের প্রতি আশ্চর্য উদারতা ও করুণা দেখিয়েছেন। আর এ কারণেই তারা হাজার বছর পরেও সবার কাছে সম্মানিত, স্মরণীয় ও অনুকরণীয়। তেমন কিছু কাহিনী জানতে পারি।

এক. নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর মক্কা বিজয় এবং ক্ষমা

মক্কা বিজয়ের দিন মানবজাতির ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনা ঘটেছিল। যারা তাঁকে এবং তাঁর অনুসারীদের ১৩ বছর ধরে নির্যাতন করেছে, ঘরবাড়ি ছিনিয়ে নিয়েছে, হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে–তাদের প্রতিশোধ নেওয়ার পুরো ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সর্বসাধারণের জন্য শর্তসাপেক্ষে ক্ষমার ঘোষণা দিলেন।
এ ছিল সত্যিকারের বিজয়ী নেতৃত্বের পরিচয়। শক্তি থাকার পরও প্রতিশোধ না নেওয়া, বরং ক্ষমা করা। এই উদারতা পরবর্তীতে বহু মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেছে এবং আরবের আনাচে-কানাচে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিয়ে আরবকে পরিণত করেছে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিতে। মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে তারা পৃথিবীর অর্ধেক এলাকার শাসকে পরিণত হয়।

দুই. সলাহউদ্দিন আইউবীর ক্ষমাশীলতা

ক্রুসেডের যুদ্ধের সময় মুসলমানদের অন্যতম বীর নেতা সলাহউদ্দিন আইউবী মুসলিম ভূমি দখলকারী ক্রুসেডারদের পরাজিত করেন এবং জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করেন। বিজয়ের পর তিনি প্রতিশোধ না নিয়ে উদারতা দেখান। খ্রিষ্টানদের নির্বিঘ্নে বের হতে দেন এবং সাধারণ জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। এই ঘটনায় খ্রিষ্টান ইতিহাসবিদরাও তাঁর চরিত্র ও মহানুভবতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন।

তিন. নেলসন ম্যান্ডেলার ক্ষমাশীলতা

গেল শতাব্দীর ইতিহাসে দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা স্মরণীয় হয়ে আছেন। ২৭ বছরের কারাজীবন এবং কৃষ্ণাঙ্গদের উপর শ্বেতাঙ্গদের নির্মম অত্যাচারের পর তিনি ক্ষমতা হাতে পান। তাঁর হাতে সুযোগ ছিল প্রতিশোধ নেওয়ার, কিন্তু তিনি জাতিকে এক করার পথ বেছে নেন। তিনি শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ উভয় জাতিকে সঙ্গে নিয়ে দেশে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেন। অগ্রগতির পথে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণ আফ্রিকা। তাঁর এই মহানুভবতা তাঁকে শুধু বিজয়ী নেতা নয়, উদার শাসক হিসেবেও ইতিহাসের পাতায় এক অনন্য স্থান করে দিয়েছে।

চার. ২৪ এর বিজয় ও বিনয়

২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের পূর্বে যারা এদেশে ক্ষমতায় ছিলো তারা বিশ্বাস করতো, ক্ষমতাচ্যুত হলে তাদের অন্তত পাঁচ লক্ষ নেতা কর্মীর জীবন অবসান হবে প্রতিপক্ষের হাতে। তাদের এই হিসাব-নিকাশ নিতান্ত অনুমান নির্ভর ছিল না। তারা মানুষের ওপর যে নির্মম নিপীড়ন চালিয়েছিল তার রিএকশন হিসেবে এটা তারা কাম্য ভেবে রেখেছিলো। কিন্তু ঘটনা ঘটলো ঠিক তার উল্টো। এত বড় একটা অভ্যুত্থান হওয়ার পরে সারাদেশে ক্ষমতাচ্যুতদের একজন মানুষেরও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। ষোল বছর ধরে চলা জুলুম এবং চরম নির্যাতনের শিকার জনগণ এক্ষেত্রে ভীষণ উদার ভূমিকা পালন করেছিলেন।

বিজয়ের মানে বিনীত হওয়া

বিজয়ের মুহূর্তে মানুষের ভেতরে অহংকার জন্ম নেওয়া খুব স্বাভাবিক। কিন্তু বিজয়ের সৌন্দর্য তখনই ফুটে ওঠে, যখন বিজয়ী পক্ষ শক্তিকে অহংকারে নয়, বিনয়ে রূপান্তর করতে পারে। ক্ষমা, সহনশীলতা, উদারতা–এগুলো দুর্বলতার নয়; বরং শক্তিমান মানুষের গুণ। পবিত্র কুরআনেও বিজয় লাভ করার পরে মহান স্রষ্টার প্রতি মস্তক অবনত করতে বলা হয়েছে।
বিনীত বিজয়ী জানে–
বিজয় কোনো সমাপ্তি নয়; এটি নতুন দায়িত্ব, নতুন চ্যালেঞ্জ এবং নতুন এক পথচলার সূচনা।

একজন প্রকৃত বিজয়ী কখনো অর্জনে আটকে থাকে না। সে জানে সামনে আরো পথ আছে, আরো পরীক্ষা আছে, আরো উন্নতি আছে। যে বিজয় তাকে স্থির করে ফেলে, সেটি কখনো স্থায়ী বিজয় নয়।

যুগে যুগে দেখা গেছে–
যেসব জাতি বিজয় অর্জন করে আত্মতুষ্টিতে ডুবে গেছে, অহংকার করেছে, প্রতিশোধ নিয়েছে তারা দ্রুত পতনের মুখে পড়েছে।
আর যারা বিজয়ের পরও জ্ঞান, নীতি, ন্যায়বিচার, সহনশীলতা ও উন্নতির পথে এগিয়েছে– তাদের সাফল্যও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, বিজয় শক্তির নয়, চরিত্রের পরীক্ষা। যে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে, তার বিজয়ই সত্যিকার বিজয়। ■



পল্টন থেকে রামপুরা
মুনীরুল ইসলাম

আমি এখন আর থাকি না পল্টনে
তাই বলে কি খুঁজতে হবে লণ্ঠনে?
নারে নারে হবে নারে খুঁজতে রে
ভাড়া বাসার ব্যাপার হবে বুঝতে রে।

থাকছি এখন মিলেমিশে রামপুরা
আগের মতোই চলছে আমার কাম পুরা
জুমাবারে আগ্রহীদের ঢল নামে
আকাশ থেকে লেখক হওয়ার বল নামে।

মেতে উঠি আবার সবাই আড্ডাতে
লেখার নেশায় আবার ছুটি বাড্ডাতে
পাশেই আছে বেশ মনোরম হাতিরঝিল
নতুন করে বাড়ছে আরো খাতির-মিল।

হাতিরঝিলে কাব্য ছড়া গল্প হয়
ফাঁকে ফাঁকে হাসি-কৌতুক অল্প হয়
ছুটে আসে মালেক জামিল সিকান্দার
লেখকের আর কাটে সময় কি শানদার?

দুটো শালিক
আবুল হোসেন আজাদ

দুটো শালিক রোজই দেখে খোকা বাড়ির উঠোনে
বাঁধবে বাসা তাই ওরা যায় দু'ঠোঁটে খড় কুটো নে।
ও যে হলো ছোট্ট খোকা পারে না গাছে উঠতে
শুধু পারে উঠোন জুড়ে একা একা ছুটতে।

ডিম পেড়ে মা শালিকটা যে বাসায় বসে তা দেয়
ছোট্ট খোকা খেয়াল রাখে কখন শালিক ছা দেয়।
আঠারো দিনে ডিম ফুটে যে বাহির হলো ছানা
ছোট্ট খোকা খুশিতে তাই উঠলো গেয়ে গানা।

পোকামাকড় ধরে ঠোঁটে শালিক দু'টো উড়ে যায়
ছানা দু'টো মায়ের দেয়া খাবার যে পেট পুরে খায়।
ধীরে ধীরে ছানা দু'টোর বড় হলো পাখনা
খোকা বলে বাসায় তোরা আর কটাদিন থাক না।
দু-এক করে এমনিভাবে বেশ কটাদিন গড়ালে
ছানা দু'টো বাইরে আসে সূর্যটা রোদ ছড়ালে।
মা ও বাবার পিছু ছানা দু'টো ঘুরে বেড়ায়
মুগ্ধ চোখে চেয়ে খোকা চোখটা আর না ফেরায়।





বাউল ও বাঁশিওয়ালা

এনায়েত রসুল

এক.

ছেলেটির বাবা নেই– মাও নেই। বাড়ি নেই– ঘর নেই। হালের বলদ বা দুধেল গাই নেই। কারো কাছে সেই ছেলেটির কোনো চাওয়া নেই– তাই পাওয়া না-পাওয়া নিয়ে দুঃখও নেই। আছে শুধু প্রতিকূল পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টা।
যে গ্রামে ছেলেটি বাস করে সেই গ্রামে এক মোড়ল আছেন। সেই মোড়লের গরু-বাছুর দেখাশোনা করে ছেলেটি, তাই সবাই তাকে ডাকে রাখাল ছেলে।
রাখাল ছেলে মোড়লবাড়ির গোয়ালঘরে ঘুমোয়। সাতসকালে ঘুম থেকে উঠে গরু-বাছুর নিয়ে মাঠে যায়– সন্ধ্যারাতে ফিরে আসে। তবু তার কাজ শেষ হয় না। গোয়ালঘরে গরু-বাছুর তুলে ধূপ-ধুনো দেয়। গরু-বাছুরের সামনে ঘাস-বিচালি মেলে ধরে। ওদের খাওয়া শেষ হয়। তারপর তার অবসর মেলে। ছেলেটি তখন খেয়েদেয়ে ঘুমোতে যায়। গোয়ালঘরের এক কোণে পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে সে।
সেই রাখাল ছেলেটির যে একেবারেই কিছু নেই– সে কথাও সত্যি নয়। নেই নেই করেও রাখাল ছেলেটির একটি সম্পদ আছে– অতি সাধারণ একটি বাঁশের বাঁশি। সারাটা সময় সে সেই বাঁশিটিকে সঙ্গে রাখে। যখন ইচ্ছে হয় তখন বাঁশি বাজায়। আর যখন বাঁশি বাজায় তখন চারপাশের পরিবেশে তার প্রভাব পড়ে। পাখিরা বাঁশির সুরের সঙ্গে নিজেদের সুর মেলায়। সুখীজনের মন সুরের তালে দুলে ওঠে। দুখীজন সুরের মাঝে সুখ খুঁজে পায়। কিন্তু রাখাল ছেলে তা বুঝতেও পারে না। কারণ সে বাঁশি বাজায় নিজের মাঝে নিজেকে বিলীন করে দিয়ে। অন্য কিছু দেখার প্রয়োজন অনুভব করে না সে।
যে মাঠে ছেলেটি গরু চরায় সেই মাঠে একটি গাছ আছে– ঝাঁকড়া পাতাওয়ালা ছাতিম গাছ। রোদে শরীর তেতে গেলে সেই গাছের নিচে গিয়ে বসে রাখাল ছেলে। তারপর আপন মনে বাঁশি বাজায়। বাঁশির সুর দূর থেকে দূরে ছড়িয়ে পড়ে। একদিন নয়– প্রতিদিন। দিনের পর দিন এমন করেই সে দিন কাটায়।

দুই.

সেদিন কাঠফাটা রোদে আকাশটা ঝাঁ ঝাঁ করছিলো। সারা মাঠে গরু চরিয়ে ঘেমে-নেয়ে একাকার হয়েছিলো রাখাল ছেলে। তাই ছুটে এসে গাছের ছায়ায় বসেছিলো। হাতে তুলে নিয়েছিলো বাঁশের বাঁশি।

রাখাল ছেলের চিরচেনা মাঠের বুক চিরে একটা সরু পথ কোনো এক লোকালয়ের দিকে চলে গেছে। সে যখন বাঁশি বাজাচ্ছিলো সেই পথ দিয়ে তখন এক বাউল বুড়ো যাচ্ছিলেন। যেতে যেতে তার মনে হলো, কোনো এক অদৃশ্য শক্তি যেনো তাকে পিছু টানছে। কেউ যেনো তার মনের ভেতর কথা বলছে! তাকে বলছে– এখানে একটু দাঁড়াও, হে বাউল! এমন সৌন্দর্যকে অবহেলা করে তুমি এগিয়ে যেয়ো না।

বাউল বুড়ো সৌন্দর্যের ভক্ত। তাই তিনি সৌন্দর্যের আহ্বানকে এড়িয়ে যেতে পারলেন না। রোদ ঝাঁ ঝাঁ পথে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। কে তার মনের ভেতর বসে সৌন্দর্য উপভোগের কথা বলছে, তা বোঝার চেষ্টা করলেন। সে সময় বাঁশির সুর তার কানে এলো। সেই সুর শুনে তিনি বুঝতে পারলেন, এই সুরই তার মনের ভেতর কথা বলেছে। তার চলার গতি থমকে দিয়েছে। কিন্তু এমন মিষ্টি সুরে বাঁশি বাজাচ্ছে কে?

কৌতূহলী বাউল বুড়ো এদিক-ওদিক তাকালেন। তাকাতে তাকাতে এক সময় তার চোখ পড়লো রাখাল ছেলের ওপর। তিনি দেখলেন, ছাতিম গাছের নিচে বসে এক কিশোর আপন মনে বাঁশি বাজাচ্ছে।

বাউল বুড়োর আর পথচলা হলো না। বাঁশির সুর আগেই তাকে থমকে দিয়েছিলো– এবার সেই সুর তাকে কাছে টেনে নিলো। তিনি ধীরে ধীরে ছাতিম গাছের নিচে গিয়ে বসলেন। কিন্তু রাখাল ছেলে তা বুঝতেও পারলো না। কারণ তার চোখ ছিলো বন্ধ– চোখ বন্ধ রেখেই সে বাঁশি বাজায়। শুধু আজ নয়– প্রতিদিন।

রাখাল ছেলের বাঁশির সুরে কী ছিলো কে জানে! সেই সুর শুনে বাউল বুড়োর চোখ দুটো নিজের অজান্তেই ভিজে এলো। তিনি হৃদয় নিংড়ে চোখের পানি ঝরালেন– কাঁদলেন অঝোর ধারায়। কতোক্ষণ কাঁদলেন কে জানে! সেই কান্না থামলো বাঁশি থেমে যাওয়ার পর।

বাঁশি বাজানো বন্ধ করলেও রাখাল ছেলে চোখ খুললো না। সুরের আবেশে বিলীন হয়ে সে বসে রইলো। এভাবে অনেকটা সময় কেটে যাওয়ার পর যখন সে চোখ খুলে তাকালো, তখন বাউল বুড়োকে দেখতে পেলো। রাখাল ছেলে দেখলো– অচেনা এক বুড়ো ভেজা ভেজা চোখে অপার বিস্ময় নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন!

অচেনা মানুষটিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে রাখাল ছেলে অবাক হলো। সে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কে? আপনাকে তো কখনো আমাদের গ্রামের আশেপাশে দেখিনি!

বাউল বুড়ো বললেন, দেখোনি। কারণ এদিকে কখনো আসা হয়নি আমার। পথ চলতে চলতে আজই বা কেমন করে এখানে এসে পৌঁছুলাম, কোথায় গিয়ে শেষ হবে এ পথচলা, আমি তা জানি না। যেতে যেতে কানে এলো বাঁশির সুর। মনে হলো সেই সুর আমাকে ডাকছে। মন আগেই থেমে গিয়েছিলো– এবার থামলো পা। দেখলাম তুমি বাঁশি বাজাচ্ছো। তোমার বাঁশির সুর আমাকে টেনে নিয়ে এলো এখানে– এই ছাতিম গাছের নিচে। আমি একটু বসবো। তোমার আপত্তি নেই তো?

: না না, আপত্তি থাকবে কেনো! আপনার যতোক্ষণ ইচ্ছে আমার পাশে বসুন। আমার বরং তাতে ভালোই লাগবে। আমার পাশে তো কেউ বসে না। সবাই আমাকে এড়িয়ে চলে। সব সময়ই আমি তাই একাকী থাকি।

খুব আন্তরিকতা নিয়ে রাখাল ছেলে কথাগুলো বললো। আর সেই কথা শুনে বাউল বুড়ো স্নেহার্দ্র চোখে ওর দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, বাঁশি তো আমি কতো জনাকেই বাজাতে শুনেছি। কিন্তু তাদের সুর আমাকে এমন করে টানেনি। পথচলা থামিয়ে দেয়নি! মানুষকে টেনে নেয়ার এক বিস্ময়কর জাদু আছে তোমার সুরে। তুমি এমন সুরে বাঁশি বাজাও কেমন করে– এমন মনকাড়া সুরে?

রাখাল ছেলে বললো, কেমন করে বাজাই? এ প্রশ্নের জবাব তো আমার জানা নেই বাউল দাদু। আমি ঠোঁটে বাঁশি ছোঁয়াই, তাতে ফুঁ দিই আর সেই ফুঁ সুর হয়ে দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে। সেই সুর কোন্ সুরে বাজে, কী তার তাল আর কী তার লয়– আমি তা জানি না। জানার প্রয়োজন রয়েছে বলেও আমি মনে করি না। বাঁশিটার সঙ্গই আমাকে সুখ দেয়– আমি সেই সুখে সুখী হই। যা হোক, এ সুর আপনার ভালো লেগেছে?

বাউল বুড়ো বললেন, শুধু ভালো লাগা? কতো যে ভালো লেগেছে, আমি কেমন করে তোমাকে তা বোঝাবো? আচ্ছা ছেলে, সত্যি করে বলো তো, তুমি কি অনেক দুখী? তোমার বুকের ভেতর কি ব্যথার নদী বইছে?

: ব্যথার নদী? আমার বুকের ভেতর? কে জানে, হয়তো তেমন কিছু বয়ে চলেছে– হয়তো একেবারেই তা নয়। আসলে কি জানেন দাদু! সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা– এসব কেমন, আমি তা বুঝি না। বোঝার মতো অনুভূতি আমার ভেতর শিকড় গাড়েনি। তবে বুকের ভেতর একটা হাহাকার আছে– অর্থহীন জীবন বয়ে বেড়াবার হাহাকার। ওটা সবসময় আমি অনুভব করি।

: হাহাকার অনুভব করো? সবসময়? আশ্চর্য! আমিও তো অমন অনুভব করি। কী যেনো নেই, কী যেনো নেই- অনুভূতি অষ্টপ্রহর আমাকে তাড়িয়ে ফেরে। মনে হয় এক অর্থহীন জীবন বয়ে বেড়াচ্ছি আমি। মূল্যহীন এক ব্যর্থ জীবন।

: তাই? আপনারও এমন মনে হয়?

: হ্যাঁ ভাই, তেমনই মনে হয় সারাটা ক্ষণ। এ জীবনের অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছি। অনেক কিছু দেখেছি। শিখেছি। আমার ভেতরের আমিটাকে চিনতে পেরেছি। তাই বুঝতে পেরেছি নিজের মূল্য। বুঝেছি, বৃথাই বেঁচে আছি আমি। আমার তো এমন মনে হতেই পারে- জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি আমি। কিন্তু তোমার মনে হচ্ছে কেনো? তুমি তো এক সদ্যকিশোর। জীবন-পথের নতুন পথিক। দু পা হেঁটেই তুমি হাঁপিয়ে উঠেছো কেনো?

রাখাল ছেলে বললো, জানি না বাউল দাদু। জানার প্রয়োজনও বোধ করি না। প্রয়োজন বোধ করি শুধু বাঁশিটার সঙ্গ। বাঁশি বাজাই। মন ভালো থাকলে বাজাই- মন খারাপ থাকলেও বাজাই। কেনো যে বাজাই, নিজেও তা জানি না।

বাউল বুড়ো বললেন, তুমি জানো না, তবে আমি জানি।

: আপনি জানেন? আমি কেনো বাঁশি বাজাই তা জানেন আপনি?

: হ্যাঁ ভাই, আমি তা জানি। আমি জানি, বাঁশি তোমার মন, রক্ত আর অস্তিত্বের সাথে মিশে আছে। তাই ইচ্ছেয় হোক বা অনিচ্ছেয়, বাঁশি তোমাকে বাজাতেই হয়। তোমার কী মনে হয়? আমি কি ঠিক বলেছি?

রাখাল ছেলে বললো, আপনি জ্ঞানী। আপনার কথাই হয়তো সত্যি। আসলে মানুষকে তো একটা কিছুকে আঁকড়ে ধরেই বেঁচে থাকতে হয়- আমি বাঁশিকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে আছি। বাঁশি ছাড়া আর কিই বা আছে আমার!

বাউল বুড়ো বিড়বিড় করে বললেন, ঠিক বলেছো। তুমি আঁকড়ে আছো বাঁশি আর আমি আঁকড়ে আছি সুর। তুমি বাস করছো দুরন্ত কৈশোরে আর আমি মৃত্যুছোঁয়া বার্ধক্যে। জীবনের দু-প্রান্তে অবস্থান করছি আমরা দুজন। অথচ বসে আছি পাশাপাশি- কাছাকাছি। অবাক লাগে ভাবতে, কী বিচিত্র এ জীবন!

বাউল বুড়ো এ কথাগুলো অস্ফুট স্বরে বলছিলেন, প্রায়

স্বগতোক্তির মতো বিড়বিড় করে। তাই রাখাল ছেলে তা শুনতে পেলো না। তবে অনুভব করলো, বুড়ো কিছু বলছেন। তাই জিজ্ঞেস করলো, দাদু! কিছু বলছেন?
বাউল বুড়ো ম্লান হাসলেন রাখাল ছেলের প্রশ্ন শুনে কিন্তু প্রশ্নের জবাব দিলেন না। তাই রাখাল ছেলেকে আবার প্রশ্নটা করতে হলো- ও দাদু! গুনগুন করে কী বলেছেন? আমাকে বলেছেন?
আত্মমগ্ন হয়ে কী যেনো ভাবছিলেন বাউল বুড়ো। তিনি চমকে উঠে বললেন, তোমাকে কিছু বলেছি কি না? না ভাই, তোমাকে কিছু বলিনি। আমার নিজেকে বলাই শেষ হয়নি, তোমাকে বলবো কী! সূর্য মাঝ আকাশ পেরিয়েছে। আমাকে এখন যেতে হবে।
: এখনই চলে যাবেন?
: হ্যাঁ ভাই, যেতেই হবে। যাবার আগে তোমাকে যদি কিছু দিয়ে যেতে পারতাম, আমার ভালো লাগতো। কিন্তু দেয়ার মতো কিছুই নেই আমার। আমি যে বড়োই নিঃস্ব।
রাখাল ছেলে বললো, আপনার একটা সুন্দর মন আছে। জীবন থেকে কুড়িয়ে নেয়া অভিজ্ঞতা আছে। আপনি নিঃস্ব নন দাদু। তা ছাড়া আমাকে কিছু দিতে হবে না! কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই আমার।
বাউল বুড়ো বললেন, তুমি ভাবছো তোমার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমি জানি, প্রয়োজন আছে। সবারই কিছু না কিছুর প্রয়োজন থাকে। কেউ তা বুঝতে পারে আর কেউ পারে না। যেমন তুমি পারছো না।
: আপনি যদি বুঝে থাকেন আমার প্রয়োজন রয়েছে, তাহলে আপনিই বলুন, কী সেই প্রয়োজন?
বিনয়ের সাথে জানতে চাইলো রাখাল ছেলে। তার প্রশ্নের জবাবে বাউল বুড়ো বললেন, বাঁশির সঙ্গে জীবন বেঁধেছো তুমি। তোমার রয়েছে নতুন নতুন সুরের প্রয়োজন। সেই সুর আমি তুলে দেবো তোমার বাঁশিতে। কিন্তু...
কথা শেষ হলো না। থমকে গেলো বাউল বুড়োর কণ্ঠ। তাতে রাখাল ছেলের কৌতূহল আরো বেড়ে গেলো। সে জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু কী দাদু? বলুন, দয়া করে আমার কাছে কিছু লুকোবেন না। কিন্তু কী?
বাউল বুড়ো বললেন, না, লুকোবো না। চন্দ্র-সূর্যের মতো যা সত্য, তাকে কি লুকিয়ে রাখা যায়? দ্বিতীয় সত্তা হিসেবে বাঁশিকে বেছে নিয়েছো তুমি। কিন্তু বাঁশিকেই বেছে নিয়েছো কেনো? অন্য কিছু বেছে নিলেও তো পারতে!
: হয়তো পারতাম। কিন্তু আপনি এ কথা বলছেন কেনো?
: বলছি, কারণ বাঁশি কখনো বাঁশিওয়ালাকে সুখ দেয় না। বারবার শুধু দুখের সাগরে ভাসায়।
রাখাল ছেলে বললো, তা ভাসাক- যতো ইচ্ছে বাঁশিওয়ালাকে ভাসাক। বাঁশির সুর যাকে মুগ্ধ করবে, তাকে না ভাসালেই হলো।
বাউল বুড়ো বললেন, আমি জানতাম তুমি এমন কথাই বলবে। প্রকৃতির এ এক অদ্ভুত নিয়ম। কেউ দুঃখকে এড়িয়ে চলে– কেউ পরম মমতায় দুঃখকে বুকে টেনে নেয়। তুমি বুকে টেনে নিয়েছো।
: আপনার কি তাই মনে হয়- আমি দুঃখকে বুকে টেনে নিয়েছি? যদি নিয়েই থাকি, তবে কি আমি ভুল করেছি?
জিজ্ঞেস করলো রাখাল ছেলে। বাউল বুড়ো বললেন, ভুল না সঠিক, তা বোঝার সাধ্য কি আমার আছে? এ ভার সময়ের ওপর ছেড়ে দাও। সময়ই একদিন এ প্রশ্নের জবাব দেবে।
কথা শেষ করে বাউল বুড়ো আকাশের দিকে তাকালেন। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে আক্ষেপের সুরে বললেন, হলো না। চেয়েছিলাম, কিন্তু তা আর হলো না।
রাখাল ছেলে শুনতে পেয়েছিলো কথাটা। তাই জিজ্ঞেস করলো, কী হলো না দাদু?
বাউল বুড়ো বললেন, সুপাত্রে দান করা হলো না। জানো তো, মানুষের ইচ্ছে-অনিচ্ছের কোনো মূল্য নেই। সৃষ্টিকর্তাই হলেন সব কিছুর নিয়ন্তা।

নিয়ন্তা? কী খটমটে একটা শব্দ! কাকে বলে নিয়ন্তা- ভাবলো রাখাল ছেলে। তারপর বিপুল কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, বাউল দাদু! ওই যে বললেন নিয়ন্তা– নিয়ন্তা মানে কী? একটু বুঝিয়ে বলুন।
বাউল বুড়ো বললেন, কী করে বুঝিয়ে বলবো! আমিই কি নিয়ন্তার স্বরূপ জানি, না তাকে চিনি? শুধু জানি, আমাদের নিয়ন্তাই সৃষ্টি করেছেন সাত সমুদ্র, সপ্ত আকাশ, গ্রহ-নক্ষত্র আর সৃষ্টির সেরা জীব– এই মানুষকে। তার ইচ্ছে মতোই ঘটে চলেছে ঘটনা আর দুর্ঘটনা। তাই মানুষের ইচ্ছে-অনিচ্ছের কোনো মূল্য নেই। এই আমার কথাই ধরো। ভেবেছিলাম যে সুরের ভাণ্ডার রয়েছে আমার কণ্ঠে, আমি তা নিঃশেষে দান করে যাবো তোমাকে। কিন্তু হলো না। বেলা বয়ে যাচ্ছে! আমাকে অজানার পথে পা বাড়াতে হবে। তো ভাই, আমি এখন যাই। মনে রেখো, এক অধমের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিলো– এ স্মৃতিটাকে তোমার মনের কোণে জিইয়ে রেখো।।
হঠাৎ যেমন এসে বসেছিলেন, তেমনি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন বাউল বুড়ো। হাতে তুলে নিলেন একতারাটি– তারপর পা বাড়ালেন অজানার পথে। ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে, নিঝুম দুপুরের নীরবতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছড়িয়ে পড়লো তার সুমিষ্ট সুর-

দিন আমার কাইট্যা গেলো
গভীর ঘুমের মাঝে,
আমি মরি শরম-লাজে
এ জীবন লাগলো না আর কাজে...

ধীরে ধীরে বাউল বুড়োর কণ্ঠ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এলো। একতারার টুং টাং মিলিয়ে গেলো। দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন অচেনা সেই বাউল বুড়ো।

তিন.

বাউল বুড়ো দূর থেকে দূরে চলে যাওয়ার পর নিজেকে ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হলো রাখাল ছেলের। সে গরু-বাছুরগুলোর দিকে তাকালো। ওরা আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আরো অনেকটা সময় রাখাল ছেলেকে প্রয়োজন পড়বে না ওদের। রাখাল ছেলে তাই বাঁশি তুলে নিয়ে ঠোঁটে ছোঁয়ালো। কিন্তু সেই বাঁশিতে সুর তুলতে পারলো না। তার আগেই সে নিজের ভেতর এক ধরনের অবসাদ অনুভব করলো। মনে হলো, সবচেয়ে আগে একটু ঘুমিয়ে নেয়া দরকার।
ছাতিম গাছের শীতল ছায়ায় ছাতিম শিকড়ে মাথা রেখে চোখ বুজলো রাখাল ছেলে। সে চোখে নেমে এলো গাঢ় ঘুম। সেই ঘুমে অনেকটা সময় কেটে গেলো। সূর্য নিভু নিভু হয়ে ছায়া ছড়ালো– তবু ছেলেটির ঘুম শেষ হলো না।
তারপর অন্ধকার যখন একটু গাঢ় হলো, সে সময় রাখাল ছেলের কোমরে প্রচণ্ড এক লাথি এসে লাগলো। দুঃসহ ব্যথায় কুঁকড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো খুলে গেলো। তখন রাখাল ছেলে দেখলো, আগুনের মতো লাল টুকটুকে চোখ নিয়ে বদরাগী মোড়ল দাঁড়িয়ে আছেন। তার পায়ের নিচে পড়ে আছে ওর প্রিয় সঙ্গী বাঁশের বাঁশি। ■

মালেক মাহমুদ-এর

দু'টি ছড়া

হাতির ছড়া

হাতিটার নাতি নাকি
বন থেকে পালিয়ে
বনটাকে ঠিক রেখে
মন নেয় ঝালিয়ে।
ঝাঁঝাল যে চিৎকারে
নড়ে ওঠে বনটা
হাতিদের ছবি তোলে
হাতের এ ফোনটা।
ফোন শুধু ফোন নয়
খবরের মাধ্যম
হাতিটার নাতি নাকি
হেঁটে যায় হরদম।
হেঁটে হেঁটে দেখে সে যে
বনটার সাতকূল
ভুল করে দেখে নাতি
ফুটে আছে রাতফুল ।
রাতফুল ফুল নয়
ফুল ফোটা ম্যাপটা
মানুষেরা কেটে বন
করে দেয় চ্যাপ্টা!
বন কাটা পথ ধরে
নাতি যায় পাবনায়
হাতিটাও বনে থেকে
পড়ে গেছে ভাবনায়।





বই

বইয়ের সঙ্গে মনমিতালি বইকে কাছে রাখি
বই রাখি যেই বুক পকেটে মন হয়ে যায় পাখি।
পাখির ডানায় উড়াল দিয়ে রকেট ডানায় উড়ি
বিজলী শক্তি ধারণ করে চাঁদের দেশে ঘুরি।

চাঁদের দেশে সোনা রঙের পাইছি খুঁজে গ্রন্থ
মনানন্দে পাঠ করা মন ছুটে শেষ পর্যন্ত।
মনের ভেতর ওঠে ফুটে সুখ সারথির রেখা
সোনা রঙের বইয়ের পাতা বাংলা ভাষায় লেখা।

এ গ্রন্থটি লেখক চিনে অবাক হয়ে যাচ্ছি
ফুলের কাছে পাখির কাছে বইটি কাছে পাচ্ছি।
বাংলাদেশের লেখক তিনি আল মাহমুদ নাম যে
পাঠক হয়ে পাঠ করে মন দিচ্ছে তারে দাম যে।

কবি নজরুল সঙ্গী হলো বিপ্লবী ফুল ফুটিয়ে
চাঁদের দেশে বসায় মেলা ফুল পাখিদের নিয়ে।
নামের পাশে হাজার লেখক করছে যখন ভিড়
বাংলা ভাষা সঙ্গী আমার সঙ্গী তিতুমীর।



দশে মিলে করি কাজ

শাকের জামিল

প্রথমেই তোমাদের একটি অবিশ্বাস্য, রোমাঞ্চকর উদ্ধার অভিযানের গল্প বলতে চাই। ২০১৮ সালের ২৩শে জুন। থাইল্যান্ডের চিয়াং রাই প্রদেশের ঘটনা। ১২ জন কিশোর তাদের ফুটবল কোচের সাথে পাহাড়ি এলাকায় ঘুরতে গিয়েছিল। তারা প্রথমে সাইক্লিং করে, তারপর থাম লুয়াং নামের একটি গুহা পেয়ে সাইকেল রেখে সবাই গুহায় ঢুকে পড়ে। কৌতূহলবশতঃ গুহার গভীরে যেতে থাকে তারা। কিন্তু তখন ছিল বৃষ্টির মওসুম। সেদিন হঠাৎ অতিমাত্রায় বৃষ্টিপাত হয়। তারা ভেতরে যেতে যেতে খেয়াল করলো গুহার ভেতরে পানি ঢুকতে ঢুকতে গুহার পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তারা গুহার ভেতরে একটা উঁচু জায়গা পেয়ে সেখানে আশ্রয় নিলো। প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতে তাদের বাইরে যাওয়ার পথ পুরোটাই পানিতে ডুবে গেল। গুহার গভীরে অন্ধকার জায়গায় আটকে পড়লো তারা।

স্কুলের ছাত্ররা ফিরে না আসায় খবর ছড়িয়ে পড়লো সবখানে। পুলিশ এবং প্রাথমিক উদ্ধারকারী

টিম এসে কিছুই করতে পারলো না। পরে থাই নেভি সিলের ডুবুরিদের আনা হলো। কিন্তু তারা সাগরের পানির গভীরে গিয়ে অভ্যস্ত, গুহার সরু পথে ডাইভিং এর অভিজ্ঞতা নেই। তাই কাজ হলো না। ইঞ্জিনিয়াররা গুহাপথের পানি পাম্প করে সরাতে চেষ্টা করলেন। কিছুটা সরালেনও। কিন্তু বৃষ্টি থাকায় এই পদ্ধতিতে ফল পাওয়া যাচ্ছিল না। তখন বিদেশি এক্সপার্টদের সহায়তা নেয়া হলো। যুক্তরাজ্যের দুইজন ডুবুরি- জন ভোলানতেন এবং রিক স্ট্যানটন, যারা গুহাপথে ডুবসাঁতারে অভিজ্ঞ, তারা এলেন। অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তারা এগিয়ে গেলেন গুহাপথে। উঁচু নিচু, আঁকাবাঁকা, সর্পিল গুহাপথ। কিছু জায়গায় একটু প্রশস্ত, আবার সবচেয়ে সরু জায়গাটা দিয়ে একজন মানুষ কোনোভাবে পার হতে পারে। সেই পথ পাড়ি দিয়ে গুহার প্রবেশমুখ থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার ভেতরে গিয়ে ২ জুলাই তারিখে প্রথমবার তারা সেই কিশোরদের পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন। এর মাঝে কেটে গেছে ১০ দিন। কিন্তু উদ্ধারকারী ডুবুরি গিয়ে দেখলেন তারা সবাই চাঙ্গা আছে। ভাবতে পারো! দশদিন তারা অন্ধকার গুহায় বন্দি। ভয়েই তো মরে যাবার কথা! তার উপরে খাবার নেই। কিশোরদের ভাষ্যমতে, তারা গুহার দেয়াল চুঁইয়ে নেমে আসা পানি খেয়ে বেঁচেছিল এতদিন। আর কীভাবে তারা শান্ত ছিল? তারা জানায় তাদের কোচ, যার নাম 'একাপোল', তাদের ধ্যান করিয়েছে আর সবসময় সাহস জুগিয়েছে। বলেছে- নিশ্চয়ই কেউ না কেউ তোমাদের উদ্ধারে এগিয়ে আসবে। তাদেরকে ধীরস্থির থাকতে বলেছে, যাতে করে মুভমেন্টের কারণে শক্তিক্ষয় হয়ে কেউ দুর্বল না হয়ে যায়।

তাদের সন্ধান পাওয়ার পর সবার আগে তাদের জন্য খাবার পাঠানো হয়। তাদের আশ্বস্ত করা হয় যে তাদের শীঘ্রই উদ্ধার করা হবে। কিন্তু কীভাবে! এমন সরু গুহাপথ, যা আবার পানিতে ডুবে আছে, এমন দুর্গম জায়গা থেকে উদ্ধার অভিযানের কোনো ঘটনা আগে ঘটেনি। তার উপরে কিশোরেরা সাঁতার জানে না। তাদের কীভাবে বের করা যাবে এখান থেকে! বিশেষজ্ঞ টিমের সামনে তিনটি অপশন এলো- ১. বৃষ্টির দিন শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা, যাতে পানি কমে গেলে তাদের বের করা যায়। ২. গুহাপথে না গিয়ে পাহাড়ের উপর থেকে কিশোরদের অবস্থান পর্যন্ত পৌঁছার জন্য গর্ত খুঁড়ে পথ তৈরি করা। ৩. গুহা পথেই তাদের দ্রুত উদ্ধার করা। প্রথম অপশনে যাবার সুযোগ ছিল না, কারণ আরও মাসখানেক লাগতো বৃষ্টির দিন শেষ হতে। দ্বিতীয় অপশনের জন্য সার্ভে করতে গিয়ে দেখা গেল তারা পাহাড়ের উপর থেকে প্রায় নয়শো মিটার গভীরে গুহায় আছে। পাহাড়ে গর্ত খুঁড়ে সে পর্যন্ত যাওয়া অসম্ভব পর্যায়ের কাজ। তাই তৃতীয় উপায়টি বেছে নিলেন তারা। এর মধ্যে কেটে গেল আরো ৬ দিন। এ সময়ের মধ্যে গুহায় পর্যাপ্ত অক্সিজেন সরবরাহ করার জন্য অক্সিজেন সিলিন্ডার পাঠানো হলো। গুহাপথে সিলিন্ডার পরিবহন করতে গিয়ে 'সামান কুনান' নামে একজন থাই নেভি সিলের ডুবুরি মারা যান। অক্সিজেন পৌঁছে দিতে দিতে তার নিজের অক্সিজেনই শেষ হয়ে গিয়েছিল।

৮ জুলাই শুরু হলো কিশোরদের বের করে আনার অভিযান। বিশ্বব্যাপী মিডিয়াতে প্রতিদিনের ব্রেকিং নিউজের মধ্যে ছিল এই উদ্ধার অভিযানের আপডেট। অভিযানে অংশ নিতে থাইল্যান্ড ও বিভিন্ন দেশ থেকে আসে দশ হাজারের বেশি উদ্ধারকর্মী, শতাধিক দক্ষ ডুবুরি। এছাড়া টিমে ছিল ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, মনোবিজ্ঞানী, খাবার ও পানি সরবরাহকারী দল, লজিস্টিক টিম, পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সদস্যরা এবং হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক। টিমওয়ার্কের একটি যুগান্তকারী ঘটনা ছিল এই উদ্ধার অভিযান। বিশেষজ্ঞরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে প্রতিদিন চারজন করে বের করা হবে। কিশোররা যাতে ভীত হয়ে না পড়ে এবং উদ্ধারকাজে বিঘ্ন না ঘটায় সেজন্য চিকিৎসকদের পরামর্শ চাওয়া হলো। তারা বললেন তাদেরকে চেতনানাশক ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে অক্সিজেন মাস্ক লাগিয়ে বহন করে নিয়ে আসতে হবে। ডুবন্ত গুহাপথে প্রায় ৫-৬ ঘণ্টা ধরে একেকজন কিশোরকে বয়ে নিয়ে নিয়ে আসে ডুবুরিরা। সেদিন চারজনকে উদ্ধার করা হয়। তারপরের দুই দিনে আরও ৪ জন করে ৮ জনকে বের করা হয়। সবশেষে তাদের কোচ একাপোলকে উদ্ধার করা হয়।

বিশ্ব গণমাধ্যমে এই ঘটনাকে বলা হয়- Miracle of Thailand. নিউজের হেডলাইন হলো- Mission impossible has become Mission Incredible. আটকে পড়া সব মানুষকে জীবিত, অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করতে পেরে কান্নায় ভেঙে পড়েন উদ্ধারকারীরা। টিভির সামনে বসা বিশ্বের কোটি কোটি দর্শক দীর্ঘদিনের রুদ্ধশ্বাস অবস্থা থেকে মুক্তি পায়, আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়।

এই পুরো ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি টিমওয়ার্কের গুরুত্ব কতখানি। ১২ কিশোর এবং তাদের কোচ ছিল গুহায় আটকে পড়া টিমে। আর বাইরে ছিল হাজার হাজার মানুষের টিম। আটকে পড়া টিমের সদস্যরা একজন আরেকজনকে উৎসাহ দিয়ে, সাহস দিয়ে, আশা দিয়ে চাঙ্গা রেখেছিল। আর বাইরের হাজার হাজার মানুষের টিম বিস্তারিত গবেষণা করে উদ্ধারের উপায় বের করেছে, শেষ পর্যন্ত সফলভাবে উদ্ধার করেছে।

টিমওয়ার্ক কী সেটা তো আর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। তোমার স্কুলের এসাইনমেন্ট করার জন্য টিমওয়ার্ক করতে হয়। কোনো পারফরম্যান্সের ক্ষেত্রে টিমওয়ার্ক লাগে। কোনো অনুষ্ঠান আয়োজন বা কর্মসূচি উদযাপন করতেও টিমওয়ার্ক প্রয়োজন। এবার চলো টিমওয়ার্কের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলি জেনে নিই।

১. টিমের প্রতিটি সদস্যের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসযোগ্যতা ও সম্মান থাকতে হবে (Respect)

২. সহযোগিতামূলক মনোভাব (Cooperation)- নিজের দায়িত্বের বাইরে গিয়ে দলকে সাহায্য করতে আগ্রহী হওয়া। অনেক সময় দলের কেউ কেউ দুর্বল থাকে। তখন বাকিদের একটু বেশি কাজ করতে হয়। এটাকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে হবে।

৩. দলের মধ্যে কোনো তথ্য ঘাটতি থাকা যাবে না। যোগাযোগ দক্ষতা থাকতে হবে (Communication Skill)

৪. ধৈর্য ও সহনশীলতা (Patience & Tolerance)- দলের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব, রুচি, মতামত সহ্য করতে পারা।

৫. দায়িত্ববোধ (Responsibility)- নিজের কাজ যথাযথ ভাবে করে সময়মতো শেষ করা।

৬. নেতৃত্বের যোগ্যতা (Leadership)- দলকে সামনে এগিয়ে নেওয়া, সঠিক নির্দেশনা দেওয়া, সমস্যা হলে দ্রুত সমাধান বের করা।

৭. ইতিবাচক মনোভাব (Positive Attitude)- সমস্যার বদলে সমাধান খোঁজা, হতাশ না হওয়া।

৮. মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা (Adaptability)- পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী সহনশীল আচরণ ও কাজ করা।

টিমওয়ার্ক সফল হবার জন্য কিছু বিষয়ে লক্ষ রাখতে হবে -

১. শুরুতেই সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণ করা। দল জানবে- 'আমরা কী করতে চাই?' 'কেন করতে চাই?' 'কখন শেষ করতে চাই?' 'কার দায়িত্ব কী?' দলকে এবং বিশেষত দলের নেতাকে কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত নিবিষ্টভাবে লেগে থাকতে হবে। কোনো ধরনের লোভ, অলসতা ও অন্যের প্ররোচনায় পথ হারিয়ে ফেললে হবে না।

২. সবার মতামত শোনা- যে কোনো পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে দলের সবাইকে কথা বলার সুযোগ দিতে হবে। কারণ কম গুরুত্বপূর্ণ কারো কাছ থেকেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ আসতে পারে।

৩. কাজ ভাগ করে দেওয়া- কে কী করবে- এটা স্পষ্ট করে দিলে ভুল কম হবে, সময়ও বাঁচবে।

৪. নিয়মিত মিটিং বা আলোচনার মাধ্যমে অগ্রগতি দেখা- দলের কাজ ঠিক পথে আছে কি না তা জানতে নির্ধারিত সময় পর পর ছোট ছোট বৈঠক করা।

৫. সমস্যা হলে দোষারোপ না করে সমাধান খোঁজা- 'কার কারণে সমস্যা হলো?' এর চেয়ে 'সমস্যা কীভাবে সমাধান করা যায়?'- এটা গুরুত্বপূর্ণ।

৬. একে অপরকে উৎসাহ দেওয়া- কেউ ভালো করলে প্রশংসা করা, পিছিয়ে পড়লে সাহায্য করা।

৭. তথ্য সবার সাথে শেয়ার করা- দলের একজন যা জানে, অন্যরা তা না জানলে ভুল বোঝাবুঝি হয়। সবার কাছে একই রকম তথ্য জানা থাকা উচিত।

৮. সময়মতো কাজ শেষ করা- নিজের কাজ দেরি করলে পুরো দল পিছিয়ে যায়- এজন্য সময়মতো দায়িত্ব শেষ করা আবশ্যক।

৯. দলগত সাফল্য উদযাপন করা- কাজ শেষ হলে দল একসঙ্গে সাফল্য উদযাপন করলে সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হয়।

১০. ভুল থেকে শেখা- দল কোথায় ভুল করেছে, পরের বার কীভাবে উন্নতি করা যায়- এটি বিশ্লেষণ করা।

একা একা আমরা ছোট ছোট পরিবর্তন আনতে পারি। বড় পরিবর্তন আনতে গেলে অবশ্যই টিমওয়ার্ক লাগবে। সেজন্য নিজেকেও একজন ভালো টিমমেট হিসেবে তৈরি করতে হবে। আবার যদি টিমের লিডারশীপের দায়িত্ব নিতে হয় তখন নেতৃত্বের যোগ্যতাও গড়ে তুলতে হবে। ■





বিজয়

শারমিন নাহার ঝর্ণা

বিজয় মানে খোলা আকাশ
উড়া স্বাধীন মনে,
বিজয় মানে মুক্ত পাখি
শান্তি প্রাণে প্রাণে।

বিজয় মানে খুশির হাসি
বিজয় মানে সুখ,
বিজয় মানে স্নিগ্ধ বাতাস
শীতল করে বুক।

বিজয় মানে ভোরের রবি
ছড়ায় খুশির আলো,
বিজয় মানে সুখের হাসি
কাটলো আঁধার কালো।

সবুজ কেনো রক্তবর্ণ

রফিক লিটন

স্বাধীনতার চাদরটাকে শক্ত করে ধরে রাখা-
লাল সবুজের পতাকাটি বুকে নিয়ে পড়ে থাকা।
সবুজ কেনো রক্তবর্ণ সবুজ কেনো শিমুল লাল,
সকল বাধা টুঁটে গেছে বিজয় দিবস হলো কাল।

মৃত্তিকাতে লেখা হলো যুদ্ধজয়ের দুঃসহ গান-
পাখির ডানায় আঁকা হলো অস্ত্র হাতে মুক্তি নিশান।
রক্তে রক্তে ফুলকি ছোটে মুক্তিকামী অযুত প্রাণ,
সকল ফুলে দুলতে থাকে শহিদের সেই তাজা ঘ্রাণ।

বিজয় দিবস লিখে দিল খোকার চোখে স্বপ্ন রাশি-
ঘুম ভেঙে সে জড়িয়ে ধরে ফুল ফসলের মিষ্টি হাসি।
সাঁঝের বেলা কাজের বেলা কোথায় গেছে স্বাধীনতা,
বুকপকেটে রাখা আছে যতো ব্যথা যতো কথা।

সবার প্রিয় শিল্পী

আব্বাসউদ্দীন আহমদ

শরীফ আবদুল গোফরান

গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে কালজানি নদী। বর্ষায় এই নদী অপরূপ শোভা ধারণ করে। নদীর ভরা রূপ দেখে একটি ছেলে উদাস হয়ে পড়েন। সুযোগ পেলেই যেয়ে বসেন নদীর পাড়ে। ভাবেন, কোথা থেকে আসছে এতো পানি। কে জোগান দিচ্ছে এই অফুরন্ত জলরাশি। নদীর কুলকুল শব্দ তার অবচেতন মনে সুরের ব্যঞ্জনা তোলে, জোরে যখন বৃষ্টি পড়ে তাদের টিনের চালের উপর তখন আরেক সুরের ঝমঝম শব্দ তার মনকে করে তোলে উন্মনা। বসন্তকালে খুব ভোরে কোকিল ডাকে, তখন ছেলেটি আর শুয়ে থাকতে পারে না। চলে যায় গাছতলায় কান পেতে শুনতে থাকে কোকিলের একটানা সুর। কোকিলের সাথে সেও কণ্ঠ মিলায়, ভাবে এতো সুন্দর সুর কোকিল শিখলো কোথা থেকে? দূরে ডাকে ঘুঘু পাখি। তার কণ্ঠেও মিষ্টি মধুর ছন্দ শুনতে শুনতে মোহিত হয়ে পড়ে বালকটি। বৌ কথা কও, পাখির ডাক যেন আরো একটু চড়া। সে যেন উচ্চকণ্ঠে সুর তুলতেই পছন্দ করে। সে ভাবে আর ভাবে এসব পাখির গলার সুরের ব্যঞ্জনা তাকে আকুল করে তোলে। গরমের দিন আরো মজার। ঘরে আর বন্দি থাকা যায় না। রাতে কাচারী ঘরের বারান্দায় বেঞ্চ পেতে শোয়া যায়। উপরে দিগন্ত বিস্তৃত নীল আকাশ। কখনো একটা দুটো তারা দৌড় দিয়ে ছুটে পালায় অন্য প্রান্তে। তার ভাবনা সেও যদি এমনি করে ছুটে যেতে পারতেন একদেশ থেকে আরেক দেশে। রাতে মায়ের কাছে ঘুমাবার সময়ও সহজে চোখে ঘুম আসে না। মাকে বলেন, ঘুমপাড়ানির গান শোনাতে। মা আর কতক্ষণ তার কাছে বসে থাকবেন। মার তো সংসারের কতো কাজ পড়ে আছে। মা চলে গেলে কান পেতে শোনেন ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। তার কাছে খুব ভালো লাগে, মধুর মনে হতো, একটুও যেন ক্লান্তি নেই। সুরের কোনো ছন্দপতন নেই। মনে হয় ঝিঁ ঝিঁ গানটা রাতেরই। ঘুম পাড়ানির গান শুনতে শুনতে একসময় ঘুমিয়ে যেতেন।



বাড়িতে বড় একটি ইঁদারা তার ভেতর শব্দ করলে কেমন ধুমধুম করে উঠে। সে ইঁদারায় ঝুঁকে গলা ছেড়ে গান গায় গানের আওয়াজ অনেক বড় হয়ে সারা ইঁদারা ভরে তোলে। গানের এই ছড়িয়ে যাওয়া ধ্বনিতে নিজেই মুগ্ধ হয়ে শোনে। ছেলের প্রাণ গানের সঙ্গে বাঁধা। যা কিছু সুন্দর সবকিছুই তার প্রিয়। মাঠ, নদী, পাখির ডাক, তারার ছুটাছুটি, চাঁদের আলো সবই তার কাছে সুরে ভরা। সবই তার গানের বিষয়। যেমন ধরো বর্ষায় সবুজ ধানে মাঠ ভরে যায়। সেই মাঠে কাজ করতে করতে চাষিরা গান গায়। কতো রকম গান পল্লীগীতি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, আরো কত গান। লম্বা সুরের টানে গান শোনা মাত্রই সে ওসব গান শিখে ফেলত। তারপর একা একা ওসব গান গেয়ে বেড়ায়। স্কুলে যাওয়ার পথে একটু আড়াল হয়ে সে গলা ছেড়ে ধরে ভাওয়াইয়া গান। কী আনন্দ হয় তখন! বড় হয়ে সত্যি সত্যি এই ছেলেটি খুব নামকরা একজন গায়ক হয়েছিলেন। গানে গানে তিনি সবার মন কেড়ে নিয়েছিলেন। এই ছেলেটি কে তোমরা কি জানো? তিনি ছোট বড় সবার প্রিয় শিল্পী আব্বাসউদ্দীন আহমদ। বাবা মা আব্বাস বলে ডাকতেন। আর এই শিল্পী আব্বাসউদ্দীন ছিলেন বাংলার এক সময়ে সাড়া জাগানো সুর শিল্পী। তার কণ্ঠ ছিল কোকিলের মতো সুমিষ্ট। এই বরেণ্য শিল্পী আব্বাসউদ্দীন আহমেদের পরিচয় জানতে হলে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ১৯০১ সালে ২৭ অক্টোবর পশ্চিমবাংলার কুচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার বলরামপুর গ্রামে ২৭শে অক্টোবর আব্বাসউদ্দীন আহমদ জন্মগ্রহণ করেন। আকিকা দিয়ে পিতা জাফর আলী আহমদ পুত্রের নাম রাখলেন শেখ আব্বাসউদ্দীন আহমদ। তার পিতা ছিলেন মহকুমা শহরের নামকরা একজন আইনজীবী। তিনি বিপুল সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। মা হীরামন নেছা ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু। এরকম অবস্থাসম্পন্ন ঘরের ছেলে হয়েও আব্বাসউদ্দিন আরাম-আয়েশ পছন্দ করতেন না।

বরেণ্য শিল্পী আব্বাসউদ্দীন আহমদ ১৯৫৯ সালে ৩০ শে ডিসেম্বর খুব ভোরে দুনিয়ার সফর শেষ করেন। ■



সুন্দরবনে চার গোয়েন্দা

আহমদ মতিউর রহমান

জামতলা বীচ। সুন্দরবন। সবুজ সুন্দর একটি বনভূমি। পাখি আর প্রাণীর অভয়ারণ্য। চারদিকে যতটুকু চোখ যায় সবুজ ঘন সবুজ। গাছগুলো জড়াজড়ি করে আছে একটার সঙ্গে আরেকটা। পাশেই ছোট্ট নদী আর খাল। দূরে বড় নদী। টলটল পানিতে নিচের অনেকখানি দেখা যায়। এদিকটায় পানি কিছুটা স্বচ্ছ। এই পানিতে আছে ভেটকি, পারশে ও মৌরলা মাছের ঝাঁক। বাতাসে পানি তির তির করে কাঁপে। এখানে পানির উপরে ঘুরে বেড়ানো পোকার দল দেখতে পাওয়া যায়।

সুন্দরবনের এই অংশে, জামতলা এলাকাটায় বাঘের বেশ আনাগোনা। ফলে ঘুরতে আসা ট্রাভেলারদের সতর্কভাবে পা ফেলতে হয়। সুন্দরবনের দক্ষিণ পূর্বকোণে মংলা বন্দর থেকে মাত্র ৯০ কিলোমিটার দূরে কটকায় রয়েছে এই সমুদ্র সৈকত। সৈকত এলাকায় ছোট বড় প্রচুর জামগাছের জন্যই এর নামকরণ। সবাই বলে এ সৈকত যেন এক বুনো সুন্দরী।

স্কুল ফাইনাল শেষে চার বন্ধু বের হয়ে পড়েছে ঘুরতে। আজিম, স্বরাজ, শিপন ও রৌদ্র। ঢাকা থেকে মংলা। সেখান থেকে লঞ্চে করে ভ্রমণ শুরু। তাদের পড়েছে পাশাপাশি দুটি রুম। এম এল নূরবাহার লঞ্চটির নাম।

সুন্দরবন ভ্রমণে লঞ্চ কেন? প্রথমে খটকা লাগল স্বরাজের মনে। স্বরাজ ঢাকার নিকেতন হাইস্কুলের ক্লাস নাইনের ছাত্র। আজিমও এই স্কুলের। তারা চার জন দুই স্কুলের। স্কুল আলাদা হলেও তাদের বাসা এক স্থানেই। ঢাকা শহরের এটাই নিয়ম। স্কুলের কাছে বাসা হয় অতি কম ছাত্রছাত্রীরই। আর বলতে হবে তারা খুবই ভাগ্যবান। অধিকাংশেরই দূরের স্কুলে আসা যাওয়া করতে হয়। আজিম আর স্বরাজ পড়ে নিকেতন হাইস্কুলে। ওরা থাকে মধ্য বাড্ডায়। সেখান থেকে স্কুল অনেকটা পথ। দু'জন নাইন থেকে উঠবে নিউ টেনে। পুরনো টেনের বন্ধুরা মার্চে এসএসসি শেষে বেরিয়ে যাবে। শিপন ও রৌদ্রও নিউ টেনের ছাত্র। ওদের বাসাও বাড্ডায়। তবে এক জনের স্কুল দক্ষিণ বারিধারায় আর আরেক জন মধুবাগ স্কুলের ছাত্র। তারা সবাই এক সাথে ক্রিকেট খেলে। কোনো অনুষ্ঠান দেখতে গেলে এক সঙ্গে যায়। আবার খেলা দেখলে জাতীয় স্টেডিয়ামে বা মিরপুর স্টেডিয়ামে যায়। মাঝে মাঝে যায় অ্যাডভেঞ্চারে। তাদের যুক্তি অ্যাডভেঞ্চারে না বেরুলে কি চলে? বাবা মাকে না জানিয়ে দলবেঁধে কোথাও যাওয়াই ওদের কাছে অ্যাডভেঞ্চার। তবে তাদের সুন্দরবন ভ্রমণ অ্যাডভেঞ্চারের চেয়ে বেশি কিছু।

কটকা হয়ে হিরণ পয়েন্ট থেকে ভোরে রওয়ানা দিয়ে ট্রলার এসে থামলো জামতলা বীচের ঘাটে। আজিম, স্বরাজ , শিপন আর রৌদ্র ধুপ করে নেমে এল বীচের পাড়ে। পাশেই গোল গাছ। নারকেল গাছের মতো এই গাছগুলোই গোল গাছ। বলছিলেন তাদের ট্যুর গাইড। আরও কত কী জানা হলো দুদিনে।

২.

ভ্রমণটা হলো আকস্মিক। শিপনের এক মামা দাওয়াত করেছেন ভাগ্নে শিপনকে। তিনি জানেন তার ভাগ্নে একজন ক্ষুদে গোয়েন্দা। মামা শফিউল বাশার খাজা কোস্টগার্ডের একজন অফিসার। কথায় কথায় এক দিন বলছিলেন,

: বিভিন্ন কারণে সুন্দরবনে হরিণ লোপাট হয়ে যাচ্ছে। যাবি নাকি রহস্য উদ্ধারে?

শিপনের মা বলেন-

: তোরা বাঘা বাঘা অফিসার কী করিস রে?



: আরে আপু, বলিস না। আমরা তৎপর বলেই তো হরিণ এখনো আছে।
: মামা আমি রাজি। এমন লোভনীয় প্রস্তাব কে ফেরায় বল? তবে আমি একা যাব না।
: আয় না তোর বন্ধুদের নিয়ে। সমস্যা নেই।
ব্যস, হয়ে গেল।
এর পর ব্যাগ গুছিয়ে বের হয়ে পড়েছে চার কিশোর।
সুন্দরবন বলতে অনেকেই জানে দুই পাশে ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে যাওয়া সরু খালের কথা। কখন বাঘ আসে এই উৎকণ্ঠা নিয়ে অজানা অচেনা পাখপাখালির কিচিরমিচির শুনতে শুনতে এগিয়ে চলা, গভীর বনের ভিতর হঠাৎ দেখা যায় বানর, হরিণ পাল এবং নানা রকম বন্য প্রাণীর পানি পান করতে আসার দৃশ্য। ট্রলার বা লঞ্চে যেতে যেতে কখনো আবার শুশুক এর খেলা করার দৃশ্য চোখে পড়ে। এভাবে সুন্দরবন ভ্রমণের বড় একটা অংশ কেটে যায় নদী আর খালেই। এটা এই চারজনের নতুন অভিজ্ঞতা।
এভাবে লঞ্চে করে সুন্দরবন দেখতে হবে এমন ধারণা তাদের ছিল না। আজিম ভাবে মানুষ আসলে কত কিছু জানে না! এই দলের মধ্যে আজিম সবচেয়ে বুদ্ধিমান। তার মাথা থেকে আসে অনেক সুন্দর সুন্দর ডিসিশন। বাকি সবাই তা মেনেও নেয়।
এই সুন্দরবনে যে সমুদ্রসৈকতও আছে তা কিন্তু অনেকেই জানে না। আজিমেরও জানা ছিল না। জামতলা বীচে নেমে সেটা টের পাওয়া গেল। প্রায় তিন কিলোমিটার ঘন সুন্দরী, গেওয়া, গরান, এবং কেওড়ার বন পেরিয়ে সৈকতে যেতে হয়। জামতলা সমুদ্র সৈকতের পথে শুধু ম্যানগ্রোভ বন নয়, বেশ খানিকটা ফার্নের ঝোপও পেরুতে হয়। পথে একটি পর্যবেক্ষণ টাওয়ারও আছে। সৈকতটির আবার দুইটি ভাগ আছে। একটাতে ঝোপঝাড় বেশি, অন্যটা একটু বেশি খোলামেলা। মাটির স্তুপ করা পলি। ধুয়ে যাওয়া মরা গাছের শেকড়, সব মিলিয়ে এক অপূর্ব সৌন্দর্য।
এক বাগান কর্মীর সাথে ভাব জমায় স্বরাজ। বাগান কর্মী তো আছেই সেই সাথে বনকর্মী। বনকর্মীরা হলেন বনভূমি রক্ষা ও পরিচালনাকারী কর্মকর্তা। তারা বনভূমি ও গাছপালা সংরক্ষণ প্রকল্পেও নিযুক্ত হন যাতে বনের মূল্য বৃদ্ধি পায়। বন রেঞ্জ অফিসাররা হলেন তারা, যারা বন সম্পদ এবং বনে বসবাসকারী মানুষের জীবন রক্ষার সাথে সম্পর্কিত। যেমন শিপনের মামা একজন রেঞ্জ অফিসার। তাদের পেশার অংশ হিসেবে এই কর্মকর্তাদের বনভূমি নিরাপদ এবং সুরক্ষিত আছে কি না তা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিদিন বনাঞ্চলে টহল দিতে হয়।
: আপনার কী নাম? বাগান কর্মীকে জিগ্যেস করে স্বরাজ।
: আবদুল জলিল। সবাই ডাকে জলিল।
: ও আচ্ছা। আমি স্বরাজ। ঢাকা থেকে এসেছি। আপনাদের এলাকা দেখতে।
: দেখেন। তবে সাবধান। এটা কিন্তু বাঘের এলাকা।
: বলেন কি?
: জে। খালের পাড়ে বাঘের পাড়া লেখা দেখেন

নাই?
: না।
: এখানে সকালে বাঘ ঘুইরা বেড়ায়। এই যে কেয়া গাছ, এর নিচে বইসা থাকে।
: বলেন কি? এখন আসবে নাকি?
: না না, অহন এহানে আইব না। রাইতে ঘুইরা বেড়ায়। ঐ যে টাওয়ার দেহেন ঐহানে।
: টাওয়ারে গেলে বাঘ দেখা যায়?
: যায়, রাইতে থাকন লাগব।
সব শুনে অবাক হয় স্বরাজ আর বাকি সবাই।

৩.

১৯৭৭ সালে সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করে ইউনেস্কো। পৃথিবীজুড়ে যে পঞ্চাশ প্রজাতির উদ্ভিদ আছে, তার পঁয়ত্রিশ প্রজাতিই পাওয়া যায় সুন্দরবনে। বাংলায় সুন্দরবন-এর আক্ষরিক অর্থ সুন্দর জঙ্গল বা সুন্দর বনভূমি। সুন্দরী গাছ থেকে সুন্দরবনের নামকরণ হয়ে থাকতে পারে, যা সেখানে প্রচুর জন্মায়। তবে সাধারণভাবে ধরে নেয়া হয় যে সুন্দরী গাছ থেকেই সুন্দরবনের নামকরণ হয়েছে।

আজিম ভ্রমণে আসার আগে সুন্দরবন নিয়ে কিছু পড়াশুনা করে এসব জানতে পেরেছে। সে জেনেছে, মুঘল আমলে (১৫২৬-১৮৫৭) স্থানীয় এক রাজা পুরো সুন্দরবনের ইজারা নেন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই অঞ্চলের নদীপথে পর্তুগিজ জলদস্যুদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। এই সময় পর্তুগিজ জলদস্যুদের অত্যাচারে সুন্দরবনের অনেক সমৃদ্ধশালী জনপদ জনশূন্য হয়ে যায়। সতের শতাব্দীর শুরুতে বারো ভূঁইয়াদের অন্যতম রাজা প্রতাপাদিত্য যশোর, খুলনা, বরিশালসহ গোটা চব্বিশ পরগনা জেলার অধিপতি ছিলেন। যশোররাজ প্রতাপাদিত্য পর্তুগিজ জলদস্যুদের সঙ্গে বারবার সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন। তিনি সাগর দ্বীপ, সরসুনা, জগকূল প্রভৃতি অঞ্চলে দুর্গ বানিয়ে এদের আটকাবার চেষ্টা করেন।

সেনরাজা লক্ষ্মণসেন-এর সুন্দরবনলিপি থেকে জানা যায়, দ্বাদশ শতকের শেষে (১১৯৬ খ্রিষ্টাব্দ) অযোধ্যা থেকে আগত পালবংশের 'মহারাজাধিরাজ' উপাধিধারী শ্রীমদ্ ডোম্মনপাল নামে এক সামন্ত রাজা উত্তর-পশ্চিম সুন্দরবনের 'পূর্বখাড়ি'তে (বর্তমান খাড়ি গ্রাম) স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন।

১৭৫৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের কাছ থেকে স্বত্বাধিকার পাওয়ার পরপরই সুন্দরবন এলাকার মানচিত্র তৈরি করা হয়। বনাঞ্চলটি সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনার আওতায় আসে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে ভারতের তৎকালীন বাংলা প্রদেশে বন বিভাগ স্থাপনের পর থেকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে সুন্দরবনের আয়তন বর্তমানের প্রায় দ্বিগুণ ছিল। বনের উপর মানুষের অধিক চাপ ক্রমান্বয়ে এর আয়তন সংকুচিত করেছে।

পৃথিবীর সর্বাধিক একক লবণাক্ত জলাভূমি, দেশের একক বনভূমি সুন্দরবন। অর্থনীতিতে এ বনের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তবে বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ সুন্দরবনের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য এখন সঙ্কটাপন্ন। জলবায়ু পরিবর্তন, দূষণ, অনিয়ন্ত্রিতভাবে গাছকাটা, সচেতনতার অভাব এবং কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় হারিয়ে যাচ্ছে বনের মূল্যবান প্রাণিসম্পদ। একসময় এ বনে বাস করত চারশো প্রজাতির পাখি। কমতে কমতে এখন দাঁড়িয়েছে ২৭০ প্রজাতিতে। বিলুপ্ত হয়েছে একশো তিরিশ প্রজাতির পাখি। সারা বিশ্বে বিপন্ন একত্রিশ প্রজাতির প্রাণী এখনো সুন্দরবনে টিকে আছে।

তার মানে চোরা শিকারীরা সুন্দরবনকে ফোকলা করে ফেলছে।

সুন্দরবন ঘূর্ণিঝড় থেকে দেশকে বাঁচায়। সে বুক দিয়ে আগলে রাখে পুরো দেশকে। রয়েল বেঙ্গল টাইগার হচ্ছে সুন্দরবনের প্রধান আকর্ষণ। আজিম ভাবে, আহা! যদি বাঘ মামার দেখা পেত, কতই না ভালো হতো।

স্বরাজ লঞ্চে শুয়ে শুয়ে সে দিন বলছিল-
: আমার মন বলছে বাঘ মামার দেখা পাবো রে আজিম।
: তাই নাকি রে? তো জামতলায় থেকে গেলেই তো হতো। টাওয়ার থেকে দেখতে পেতি?
দু'জনের কথায় হেসে দেয় শিপন ও রৌদ্র। শিপন বলে-
: তোরা থামবি?
শুয়ে শুয়ে কয়েকটি প্রতিবেদনের দিকে নজর বুলায় আজিম। একটিতে লেখা-

"সুন্দরবন বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন এবং বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের একটি অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ। এই বন এর জীববৈচিত্র্যের জন্য বিখ্যাত। বিশেষ করে রয়েল বেঙ্গল টাইগার এবং চিত্রা হরিণের জন্য। সুন্দরবনের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করতে হরিণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে অবৈধ শিকার, বন-দস্যুতা এবং সচেতনতার অভাবে বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে নিরীহ প্রাণীটির। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত পৃথক অভিযান চালিয়ে ছ'শো একচল্লিশ কেজি হরিণের মাংস, একটি জবাই করা হরিণ, একটি মৃত হরিণ, হরিণের দুটি চামড়া, দুটি মাথা, আটটি পা উদ্ধার করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।"

অবাক হয় আজিম। তাহলে কাহিনি এই?
আরও একটি পেপার ক্লিপিং বের করে আজিম। তাতে লেখা-

"হরিণ শিকারের মাধ্যমে আমরা শুধু হরিণকেই হত্যা করছি না, বরং সুন্দরবনের সমগ্র বাস্তুতন্ত্রকে এক ভয়াবহ হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছি। পর্যটন খাতেও হরিণ একটি গুরুত্বপূর্ণ। চিত্রা হরিণ দেখতে বহু দেশি-বিদেশি পর্যটক সুন্দরবনে আসে। হরিণ না থাকলে এই পর্যটনের আকর্ষণ অনেক কমে যাবে এবং এর ফলে আর্থিক ক্ষতি হবে। তাই হরিণ সংরক্ষণ শুধু পরিবেশের জন্য নয়, আমাদের অর্থনীতির জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। অবৈধ শিকারিদের দৌরাত্ম্য সুন্দরবনের এক মারাত্মক সমস্যা। বন বিভাগের পর্যাপ্ত জনবল ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতার অভাবে শিকারিরা সহজেই বনে ঢুকে পড়ে এবং ফাঁদ পেতে হরিণ ধরে নেয়। এদের অনেকেই সংঘবদ্ধ চক্রের সদস্য, যারা চামড়া, মাংস এবং হরিণের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কালোবাজারে বিক্রি করে থাকে।"

এ পর্যন্ত পড়ে থামে আজিম। তার আর বুঝতে বাকি নেই ঘটনা আসলে কী।

তার মানে সুন্দরবনে থামছে না হরিণ শিকার। চিরল চিরল পাতার সুন্দরবন, চিত্রা হরিণের সুন্দরবন আসলে সংঘবদ্ধ চোরা শিকারি চক্রের কাছে অসহায় হয়ে পড়েছে। (চলবে)



বিজয়ের রং

সাবরিন সুলতানা

ক্লাসজুড়ে রঙের উৎসব। বিজয় দিবস উপলক্ষে ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা চলছে। নানা রকম রঙের মিষ্টি গন্ধে ঘর মৌ মৌ করছে। প্রতিটি সাদা আর্ট পেপার যেন লাল-সবুজের আলোয় উদ্ভাসিত। কেউ আঁকছে স্মৃতিসৌধের দৃঢ়তা, কেউবা গ্রামের সবুজ মাঠের ওপর উড়ন্ত এক বিশাল পতাকা।

কিন্তু রিয়া স্থির। তার তুলিটা এখনো রঙের কৌটায় ডোবেনি। সাদা খাতাটার দিকে তাকিয়ে সে শুধু ভাবছে, ‘সবাই একই ছবি আঁকছে কেন? লাল-সবুজ তো কেবল পতাকার রং। কিন্তু বিজয় তো বিশাল- তার রং কি শুধু এই দুটো?’

তার বন্ধু আনিকা এসে জিজ্ঞেস করল, 'কিরে রিয়া, তুই কিছু আঁকছিস না যে? আর মাত্র এক ঘণ্টা আছে।'
রিয়া বিষণ্ন গলায় বলল, 'আমার শুধু পতাকা আঁকতে ইচ্ছে করছে না, আনিকা। মনে হচ্ছে, বিজয়ের রং তো আরও অনেক কিছুই হতে পারে।'
আনিকা একটু ভেবেচিন্তে ঠোঁট উল্টে বলল, 'কী জানি! পতাকার রংই তো বিজয়ের রং।'

রিয়া কোনো উত্তর দিল না। মন খারাপ করে সে ক্লাসের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল।
স্কুলের এক কোণায় ছোট্ট বাগান। সেখানে করিম চাচা আপন মনে গাছগুলোর যত্ন নিচ্ছে। করিম চাচা একজন মুক্তিযোদ্ধা। কিন্তু তিনি তার যুদ্ধের গল্প খুব একটা বলেন না। তার চেহারাটা শান্ত, সারাদিন ফুল-ফলের গাছ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন।
রিয়ার হঠাৎ মনে হলো, করিম চাচাই হয়তো তার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে সে তড়িঘড়ি করে বাগানের দিকে ছুটে গেল।

করিম চাচা তখন একটা কচি চারাগাছে আলতো করে পানি দিচ্ছিলেন। রিয়াকে দেখে স্নেহের হাসি হেসে বললেন, 'কী ব্যাপার, আম্মাজান? এত দৌড়ে এলে যে। আঁকাআঁকি শেষ?'

রিয়া হাঁপাতে হাঁপাতে তার মনের দ্বিধার কথা খুলে বলল। 'চাচা, সবাই লাল-সবুজ দিয়ে বিজয় আঁকছে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, বিজয়ের তো আরও অনেক রং থাকতে পারে। আপনি তো যুদ্ধ করেছেন... আপনি কি বলে দেবেন, বিজয়ের আসল রং কী?'

করিম চাচা হাসলেন। হাতের কাজ থামিয়ে রিয়ার পাশে বসলেন। তিনি বাগানের কচি সবুজ ঘাসের দিকে ইশারা করলেন।
তারপর নরম গলায় বললেন, 'এই যে সবুজ, এটা চারাগাছের রং, আবার স্বপ্নেরও রং। আমরা এমন একটা দেশের স্বপ্ন দেখতাম, যেখানে শিশুরা নির্ভয়ে চারাগাছের মতো বেড়ে উঠবে। তাই বিজয়ের প্রথম রং সবুজ।'

এরপর তিনি টকটকে লাল এক জবা ফুলের দিকে তাকালেন।
'আর এই যে লাল, এটা শুধু রক্ত নয়, আম্মাজান। এটা হলো ভালোবাসা, দেশের জন্য মানুষের ত্যাগের প্রতীক। তাই বিজয়ের আরেকটা রং লাল।'

রিয়া মুগ্ধ হয়ে মাথা নাড়ল।

করিম চাচা এবার আকাশের দিকে তাকালেন। তার চোখ যেন অনেক দূরে কিছু খুঁজছে। 'কিন্তু শোনো, বিজয়ের সবচেয়ে গোপন আর সুন্দর রংটা হলো... সোনালি।'
'সোনালি?' রিয়ার চোখে অসীম কৌতূহল।

করিম চাচা গভীর নিঃশ্বাস নিলেন, 'যুদ্ধ শেষ। যখন আমরা জয়ী হলাম, সেই ভোরে প্রথম সূর্যটা যখন উঠল, রক্ত ঢালা মাটির ওপর তার নরম সোনালি আলো এসে পড়ল। মনে হলো যেন নতুন করে জীবন শুরু করলাম। ওই সোনালি রঙই হলো...'

রিয়ার চোখ দুটো নতুন এক আলোয় ঝলমল করে উঠল। সে তার মনের ক্যানভাসটা খুঁজে পেয়েছে। সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে করিম চাচাকে শক্ত করে একটা স্যালুট দিয়ে দৌড়ে ক্লাসে ফিরে গেল।

এবার তার তুলি এক মিনিটের জন্যও থামল না। সময় আছে মাত্র আধ ঘণ্টার মতো। দ্রুত হাতে সে তার সাদা খাতায় প্রথমে আঁকল সোনালি ভোরের স্নিগ্ধ আকাশ। নিচে আঁকল এক বিশাল সবুজ মাঠ। সেই মাঠে একটি মা তার শিশুকে বুকে নিয়ে হাসছে- ঠিক যেন মুক্তির প্রতিচ্ছবি। আর সেই সবুজ মাঠের এক কোণায় সে ফুটিয়ে তুলল একটি টকটকে লাল গোলাপ।

বিকেলের দিকে ফলাফল ঘোষণা করা হলো। প্রতিযোগিতায় রিয়ার ছবিটাই প্রথম স্থান অধিকার করেছে। করিম চাচা এই খবর শুনে শান্তভাবে হাসলেন। তিনি জানেন, বিজয়ের সবচেয়ে উজ্জ্বল রং হৃদয়েই জন্ম নেয়–যা নতুন প্রজন্মের চোখে সোনালি স্বপ্নে ধরা দেয়। ■



কাশ্মীরের টিউলিপ বাগান :

রঙিন এক স্বর্গরাজ্য

সীমান্ত আকরাম

যারা ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর ভ্রমণ করেন তাদের একটা লক্ষ্য থাকে শুভ্র বরফে আবৃত পাহাড়ের পাশাপাশি আপেল বাগান, জাফরান বাগান বা টিউলিপ বাগান পরিদর্শন করা। আমাদেরও কাশ্মীর ভ্রমণের একটা আকর্ষণ ছিলো টিউলিপ বাগান পরিদর্শনের। ২০২৩ সালের কথা। রমজানের ঈদের পরদিন আমরা ছয়জনের একটা টিম গিয়েছিলাম স্বপ্নের কাশ্মীর ভ্রমণে। প্রথম দিন পেহেলগাম, দ্বিতীয় দিন গুলমার্গ এবং তৃতীয় দিন সোনমার্গ ঘুরাফিরা শেষ করি। প্ল্যান অনুযায়ী শেষ দিন তথা চতুর্থ দিনে আমরা সকাল সকাল চলে আসলাম টিউলিপ বাগান দেখতে। শ্রীনগর থেকে ডাল লেক পার হয়ে বোটানিক্যাল গার্ডেনের সামনের রাস্তা দিয়ে এগোলেই টিউলিপ গার্ডেন। আমরা একে একে গাড়ি থেকে নামলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, এই টিউলিপ গার্ডেন মাত্র এক সপ্তাহের জন্য দর্শণার্থীদের জন্য খোলা রাখা হয়। সেটা হলো মার্চের শেষ সপ্তাহে। আর আমরা গিয়েছিলাম এপ্রিলের মাঝামাঝিতে। বিষয়টি আমাদের জানা ছিলো না। প্রাচীরের

বাহির থেকেই যতটুকু দেখা গেলো তাই উপভোগ করলাম। এটি ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল টিউলিপ গার্ডেন নামে পরিচিত। শ্রীনগরের অপরূপ সৌন্দর্যের অন্যতম আকর্ষণ যা জাবারওয়ান পাহাড়ের পাদদেশে বিস্তৃত এই টিউলিপ বাগান এশিয়ার বৃহত্তম টিউলিপ উদ্যান হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছে। শ্রীনগরের মনোরম পরিবেশ, জাবারওয়ান পাহাড়ের স্নিগ্ধ ছায়া এবং টিউলিপের রঙিন আভা মিলিয়ে এটি এক স্বপ্নময় পর্যটনস্থল। যারা প্রকৃতিকে ভালোবাসেন, তাদের জীবনে একবার হলেও এই বাগানের সৌন্দর্য উপভোগ করা উচিত।

বিশ্বে বর্তমানে সৌন্দর্যমণ্ডিত এ ফুলের সাড়ে তিন হাজারের মতো প্রজাতি রয়েছে। ইউরোপসহ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে টিউলিপের চাষ হয়ে থাকে। এশিয়ার সবচেয়ে বড় টিউলিপ ফুলের বাগান ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল টিউলিপ গার্ডেন প্রায় ৭৫ একর জায়গাজুড়ে গড়ে তোলা হয়েছে। রাজধানী শ্রীনগর থেকে বাগানটির দূরত্ব ১৮ কিলোমিটার। শ্রীনগরের ডাললেক লাগোয়া বোটানিক্যাল গার্ডেন-এর পাশেই এর অবস্থান। কাশ্মীরের সৌন্দর্যকে আরও স্বর্গীয় করে তোলে এই বাগান। লন্ডনের ওয়ার্লড বুক অফ রেকর্ডসের খেতাবও রয়েছে এই বাগানের ঝুলিতে।

বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর ও স্বীকৃত ফুলগুলোর মধ্যে অন্যতম টিউলিপ। বসন্তের সবচেয়ে সুন্দর ফুল বলা হয় একে। বিভিন্ন ধরনের রঙে শোভিত এ ফুল সৌন্দর্যপ্রেমীদের আকর্ষণ করবেই। রংধনুর সব রঙেরই দেখা মেলে ফুলটিতে। টিউলিপ শব্দের অর্থ 'নিখুঁত প্রেম'। অনেক ফুলের মতো টিউলিপের বিভিন্ন রংও প্রায়শই তাদের নিজস্ব তাৎপর্য বহন করে। লাল টিউলিপ ভালোবাসার প্রতীক, বেগুনি টিউলিপ রাজকীয়তার প্রতীক। সাদা টিউলিপ দক্ষতার বার্তা পাঠাতে ব্যবহার করা হয়।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ছাড়াও নানা দেশ থেকেই পর্যটকেরা আসেন এই দিগন্তজোড়া টিউলিপ বাগান দেখতে। পাহাড়ঘেরা এই বাগানের হাঁটাপথের দুই পাশে শুধু রঙ-বেরঙয়ের টিউলিপ। লাল, কমলা, হলুদ, গোলাপি, বেগুনি, সাদা, কালোসহ নানা রং ও জাতের টিউলিপ ফোটে সেখানে। বসন্তের শুরুতেই এখানকার টিউলিপ ফুল ফোটে, যা পাহাড়ের পটভূমিতে এক রঙিন স্বর্গরাজ্যের সৃষ্টি করে। বিশেষ করে মার্চের শেষে বা এপ্রিল মাসের শুরুর দিকে গেলে সবচেয়ে বেশি টিউলিপের দেখা মিলবে। টিউলিপ বাগানে প্রায় ৭৫ ধরনের টিউলিপ রয়েছে যা নেদারল্যান্ডস, তুরস্ক, জার্মানি ও অন্যান্য দেশ থেকে আনা হয়েছে। টিউলিপ ছাড়াও, ৪৬ ধরনের ফুল রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে হাইসিন্থ, ড্যাফোডিল এবং রানুনকুলাস যা হল্যান্ড থেকে আনা হয়েছিল। প্রতিবছর ১৫ লাখ টিউলিপের উৎপাদন হয়ে থাকে এ বাগানে।

দর্শনার্থীরা যেন ফুল ছিঁড়তে না পারেন সেজন্য পুরো বাগান স্বচ্ছ নেট দিয়ে ঘেরা। জানা গেছে, ২০০৮ সালের দিকে কাশ্মীরে গড়ে তোলা হয় টিউলিপের এই বিশাল বাগান। মূলত শীত ও গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে পর্যটকের মনোযোগ কাড়তে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী গুলাম নবী আজাদের উদ্যোগে এই টিউলিপ বাগানের যাত্রা শুরু। সে সময় বাগানের নাম ছিল 'সিরাজবাগ'। পরে নাম রাখা হয় 'ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল টিউলিপ গার্ডেন'।

প্রতি বছর বসন্তের সময় এশিয়ার বৃহত্তম টিউলিপ বাগানে টিউলিপ ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করা হয়। মার্চের শেষ সপ্তাহে পর্যটকদের জন্য বাগানটি খুলে দেয় কর্তৃপক্ষ। প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত খোলা থাকে। আর এই উদ্যোগ নেওয়ার ফলে ভূস্বর্গের পর্যটন ব্যবসা ফুলে ফেঁপে ওঠে। বাণিজ্যিকভাবেও এটি একটি লাভবান ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। ২০২৩ সালে, বাগানটিতে রেকর্ড সংখ্যক দর্শনার্থীর আগমন ঘটে। ২০২৩ সালের মার্চ থেকে এপ্রিলের মধ্যে এক মাসে ৩,৬৫,০০০ পর্যটক বাগানটি পরিদর্শন করেছিলেন, যার মধ্যে ৩,০০০ বিদেশি পর্যটকও ছিলেন। ২০২৪ সালে ৪,৩০,০০০ পর্যটক বাগানটি পরিদর্শন করেছে বলে জানা যায়।

তবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় টিউলিপ বাগান দেখতে যেতে হবে নেদারল্যান্ডসের লিসি শহরে। বাগানটির নাম 'কেউকেনহোফ গার্ডেন'। অনেকের কাছে 'ইউরোপের বাগান' নামেও পরিচিত। ১৯৪৯ সালে একটি দাতব্য সংস্থার তত্ত্বাবধানে এ বাগানের গোড়াপত্তন হয়। টিউলিপ ঠান্ডা আবহাওয়া ভালোবাসে। তাই ইউরোপের শীতপ্রধান দেশগুলোতে টিউলিপ উৎপাদন বেশি হয়। টিউলিপ ফুল চাষের ক্ষেত্রে দিনের বেলা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং রাতে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সহনশীল ধরা হয়। এর চেয়ে বেশি তাপমাত্রা হলে ফুল যথাযথভাবে নাও ফুটতে পারে। স্বাভাবিকভাবে রোপণের ১৮-২০ দিনের মধ্যে কলি আসতে শুরু করে। ২৫-৬০ দিন পর্যন্ত টিউলিপ ফুল স্থায়ী হয়। বর্তমানে কাশ্মীরের ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল টিউলিপ গার্ডেনটি এশিয়ার মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

বিশ্বের অন্যতম সুন্দর ও রঙিন ফুলগুলোর মধ্যে টিউলিপ অন্যতম। এই ফুলটি তার সৌন্দর্য, রঙের বৈচিত্র্য ও চমকপ্রদ গঠনের জন্য বিশ্বব্যাপী পরিচিত। টিউলিপ ফুলের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এর অসাধারণ রঙের বৈচিত্র্য। সাদা, হলুদ, লাল, গোলাপি, কমলা, সাদা-লাল মিশ্রিত রঙসহ বিভিন্ন রঙে এটি ফুটে ওঠে। প্রতিটি টিউলিপ ফুলই যেন একটি আলাদা গল্প বলে, যা গার্ডেন বা ফুলবাগানে বিশেষ সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। টিউলিপের মৌ মৌ গন্ধে মাতোয়ারা হবেন যে কোনো পর্যটক। পাহাড়ের পাদদেশে টিউলিপ বাগানের এমন নান্দনিক দৃশ্যপট মোহনীয় করে তোলে আমাদের। ■

বিজ্ঞানের টুকরো খবর

রহস্যময় আলোর খেলা রাতের আকাশে

আকাশে যেন রঙের খেলা! পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সম্প্রতি একটি রাত সেই মেরুপ্রভার সাক্ষী থাকল। উত্তর গোলার্ধে একে বলা হয় অরোরা বোরিয়ালিস বা নর্দার্ন লাইটস। দক্ষিণ গোলার্ধে একে বলা হয় অরোরা অস্ট্রেলিস বা সাদার্ন লাইটস। সৌরঝড় পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্রে ধাক্কা দিলে দেখা যায় এই মেরুপ্রভা। স্পেস ওয়েদার প্রেডিকশন সেন্টার বলছে, ১২ নভেম্বর সৌরঝড় জি ৪ (তীব্র) পর্যায়ে পৌঁছে। ইস্টার্ন স্ট্যান্ডার্ড সময় তখন রাত ৮টা ২০ মিনিট। সে কারণে ভূ-চৌম্বকীয় ঝড় ওঠে। তা দেখা যায় ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, উত্তর আমেরিকা থেকে। সৌরবায়ুর কণা (যা আদতে ইলেকট্রন এবং প্রোটনের স্রোত)-র যখন পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্র এবং বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে সংযোগ ঘটে, তখন মেরুপ্রভা তৈরি হয়। সূর্যের করোনা থেকে উদ্গত হয় সৌরবায়ু। আকাশে সবুজ, লাল, বেগুনি রং খেলা করে। দেখে মনে হয়, আকাশে যেন নাচছে আলো। একেই বলে মেরুপ্রভা। এই অরোরা দেখা গিয়েছে আমেরিকার টেক্সাস এবং উত্তর ভারতের কিছু জায়গাতেও। এর জেরে ব্যাঘাত ঘটেছে উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা, জিপিএস, পাওয়ার গ্রিডে। সূত্র : এবিপি



সূর্যগ্রহণের সময় মেলানোর পদ্ধতি আবিষ্কার

ইউরোপীয়দের আক্রমণে আমেরিকার প্রাচীন সভ্যতার বহু মূল্যবান নিদর্শন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। নিখুঁত নিশ্চয়তায় সে যুগে সূর্যগ্রহণের দিন-ক্ষণ বাতলে দেওয়া হতো। কখনও ভুলচুক হতো না। বছরের কোন কোন সময় সূর্যগ্রহণ হবে, চাঁদ ঠিক কখন ঘুরতে ঘুরতে এসে দাঁড়াবে সূর্য আর পৃথিবীর মাঝে, একেবারে নিখুঁত মিলিয়ে দিতে পারতেন প্রাচীন মায়া সভ্যতার নাগরিকেরা। খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দ থেকে ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এই সভ্যতার ব্যাপ্তি। এই সময়ে মেক্সিকো সংলগ্ন উত্তর ও মধ্য আমেরিকার প্রাচীন মানুষ কী ভাবে মহাকাশের হিসাবে এমন নিখুঁত হলেন? কী দেখে তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করতেন? মায়া-রহস্য বহু দিন ভাবিয়েছে আধুনিক সময়ের বিজ্ঞানীদের। সম্প্রতি আমেরিকার দুই গবেষক মায়া সভ্যতার সেই 'নিঁখুত ভবিষ্যদ্বাণী'র রহস্য উদঘাটন করেছেন। হিসাব কষে নতুন করে দেখিয়েছেন, কীভাবে মায়ার সময়ে চলত আকাশ-গণনা। ইউরোপীয়দের আক্রমণে আমেরিকার প্রাচীন সভ্যতার বহু মূল্যবান নিদর্শন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। সামান্য যা কিছু এখনও বাঁচিয়ে রাখা গিয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম 'ড্রেসডেন কোডেক্স'। ৭৮ পৃষ্ঠার এই প্রাচীন পুঁথিতে জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র, ঋতু,



চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে মায়া-নাগরিকদের ধারণা লিপিবদ্ধ রয়েছে। সূত্র : বিবিসি

তিয়ানগং স্টেশনে যাবেন পাকিস্তানি মহাকাশচারী

পাকিস্তান থেকে একজন মহাকাশচারী শিগগিরই চীনের মহাকাশ স্টেশন তিয়ানগংয়ে প্রথম আন্তর্জাতিক অভিযাত্রী হতে যাচ্ছেন। চীন স্বল্প সময়ের সফরের জন্য পাকিস্তানি মহাকাশচারীদের নির্বাচনের জন্য প্রশিক্ষণ দিচ্ছে বলে জানা গেছে। চীনের ম্যানড স্পেস এজেন্সির মুখপাত্র ঝাং জিংবো জানান, দুজন নির্বাচিত পাকিস্তানি মহাকাশচারী চীনা মহাকাশচারীদের সঙ্গে প্রশিক্ষণে অংশ নেবেন। তাঁদের মধ্যে একজনকে পেলোড বিশেষজ্ঞ হিসেবে একটি স্বল্প সময়ের অভিযানে পাঠানো হবে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে চীন ও পাকিস্তান তিয়ানগংয়ে মহাকাশচারী পাঠানোর বিষয়ে একটি সহযোগিতা চুক্তি হয়। ঝাংয়ের তথ্যমতে, বর্তমানে পাকিস্তানে প্রাথমিক মহাকাশচারী নির্বাচনপর্ব চলছে। চূড়ান্ত নির্বাচন চীনে সম্পন্ন হবে। ক্রুদের দৈনন্দিন দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নভোচারীরা পাকিস্তানের জন্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালাবেন। ধারণা করা হচ্ছে, লংমার্চ ২এফ রকেটে করে গোবি মরুভূমির জিউকুয়ান স্পেসপোর্ট থেকে উৎক্ষেপিত শেনঝো মহাকাশযানের তিনজনের নভোচারীর মধ্যে একজন হতে পারেন। শেনঝো ২২ বা শেনঝো ২৩



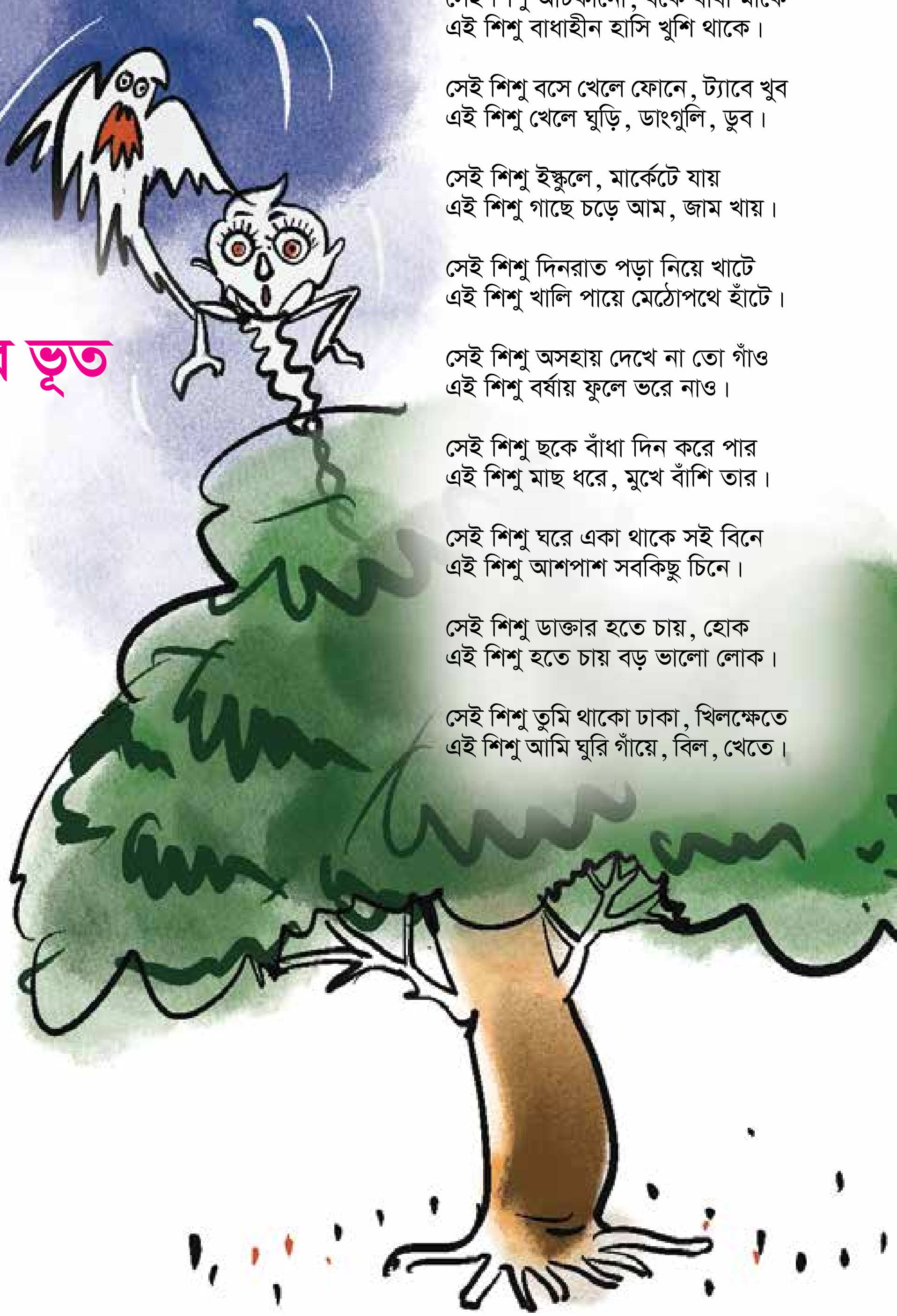
মিশনে পাকিস্তানি নভোচারী মহাকাশে যাবেন। সেখানে তিনি কয়েক দিন অবস্থান করবেন। ২০২২ সালের শেষের দিকে চালু হয় চীনে তিয়ানগং মহাকাশ স্টেশন। সূত্র: স্পেস ডটকম

সংগ্রহ : মোহাম্মদ নকিব।

তেঁতুল গাছের ভূত

মায়া সরকার

বনের ধারে ছিল একটা
মস্ত তেঁতুল গাছ,
ভূতটা সেথায় পা ঝুলিয়ে
করতো বেজায় নাচ।
কান দুটো তার কুলোর মতো
মুলোর মতো দাঁত ,
ভয়ে সামনে যেত না কেউ
থাকতো যে তফাৎ।
লিকলিকে তার পা দুখানি
মাথা মস্ত বড়,
যায় না ভয়ে কেউ সেখানে
ভয়ে জড়োসড়ো।
পাশের শেওড়া গাছটিতে যে
থাকতো পেত্নী বসে ,
মামদোর সব নাচানাচি
দেখতো হেসে হেসে।
ছোটখাটো খিটির মিটির
লাগতো মাঝে মাঝে ,
বলতো মামদো, 'পেত্নী রে তুই
মেয়েটি বড় বাজে।'
শুনে পেত্নী নাকি সুরে
চোখে আগুন জ্বেলে,
বলতো 'বেটা, তুই তো দেখি
বড্ড খারাপ ছেলে।'
তারপরেতেই বলতো দুজন
খিল খিলিয়ে হেসে,
'ঝগড়া নয় রে, থাকবো এখন
দু'জন মিলেমিশে।'



সেই শিশু এই শিশু

মুস্তাফা ইসলাহী

সেই শিশু আটকানো, বকে বাবা মাকে
এই শিশু বাধাহীন হাসি খুশি থাকে।

সেই শিশু বসে খেলে ফোনে, ট্যাবে খুব
এই শিশু খেলে ঘুড়ি, ডাংগুলি, ডুব।

সেই শিশু ইস্কুলে, মার্কেটে যায়
এই শিশু গাছে চড়ে আম, জাম খায়।

সেই শিশু দিনরাত পড়া নিয়ে খাটে
এই শিশু খালি পায়ে মেঠোপথে হাঁটে।

সেই শিশু অসহায় দেখে না তো গাঁও
এই শিশু বর্ষায় ফুলে ভরে নাও।

সেই শিশু ছকে বাঁধা দিন করে পার
এই শিশু মাছ ধরে, মুখে বাঁশি তার।

সেই শিশু ঘরে একা থাকে সই বিনে
এই শিশু আশপাশ সবকিছু চিনে।

সেই শিশু ডাক্তার হতে চায়, হোক
এই শিশু হতে চায় বড় ভালো লোক।

সেই শিশু তুমি থাকো ঢাকা, খিলক্ষেতে
এই শিশু আমি ঘুরি গাঁয়ে, বিল, খেতে।



জলহস্তির অস্বস্তি

মশিউর রহমান

জঙ্গলের ভেতর এক জলাশয়ে বাস করত জলহস্তি। এক গণ্ডার তার শরীরের কাদামাটি ধোয়ার জন্য এলো জলহস্তির জলাশয়ে। গণ্ডার জলহস্তিকে বলল, 'তুমি কি জানো তুমি দেখতে কেমন অদ্ভুত আর হাস্যকর?'

জলহস্তি বলল, 'আমি তো কাদাপানি পছন্দ করি। আমার গায়ে তো কাদামাটি থাকবেই।'

গণ্ডার বলল, 'আমিও তো কাদামাটিতে থাকি, কিন্তু তোমাকে অদ্ভুত লাগে তোমার ওই বিশ্রী নাকের জন্য।'

জলহস্তি নিচু হয়ে তার নাক দেখে বলল, 'কই আমার নাক অদ্ভুত লাগছে না।'

'তোমার কাছে কি মনে হয় না তোমার কিছু একটা নেই', গণ্ডার জিজ্ঞেস করল।

জলহস্তি মাথা নেড়ে বলল, 'না।'

'তোমার কি মনে হয় না যে তোমার কোনো শিং নেই?' গণ্ডার জিজ্ঞেস করল।

'শিং!' অবাক হয়ে বলল জলহস্তি।

'হ্যাঁ, সত্যি সত্যিই তোমার নাকের উপর কোনো শিং নেই। আর শিং ছাড়া ওই নাকের জন্য তোমাকে অদ্ভুত আর হাস্যকর লাগে।'

জলহস্তি কাদা থেকে উঠে আবার নিচু হয়ে তার নাক দেখার চেষ্টা করল। ততক্ষণে গণ্ডার চলে গেছে। জলহস্তি ভাবল, যদি আমার নাকের উপর গণ্ডারের মতো একটা শিং থাকত তাহলে আমাকে আর অদ্ভুত দেখাত না।

এই ভাবনা জলহস্তির মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল। সে খুব অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। তাকে কি সত্যিই খুব খারাপ দেখায়? এটা জানার জন্য সে বনের সবার কাছে যাবে। সবাইকে জিজ্ঞেস করবে তাকে কি দেখতে অদ্ভুত লাগে? যদি সবার কাছেই লাগে তবে সে নিশ্চিত হবে যে আসলেই একটা অদ্ভুত প্রাণী।

জলহস্তি প্রথমে সিংহের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি মনে হয় আমাকে দেখতে অদ্ভুত লাগে?'

সিংহ কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'আসলে আমি যদি সত্যি কথাটা বলি, তাহলে বলব হ্যাঁ তোমাকে সত্যিই অদ্ভুত লাগে। দেখ, তোমার কিন্তু আমার মতো কেশর নেই। যেটা থাকলে তোমাকে আমার মতোই রাজকীয় লাগত।'

সিংহ তার কেশর এদিক-ওদিক নেড়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করল যে তাকে সত্যিই রাজকীয় লাগে।

সিংহ বলল, 'আমার কথায় তুমি কষ্ট পেয়ো না।'

জলহস্তি মন খারাপ করে হাঁটতে লাগল আর ভাবল, আমার যদি সিংহের মতো চমৎকার কেশর থাকত তাহলে আমাকে আর অদ্ভুত দেখাত না।

হাঁটতে হাঁটতে জলহস্তির দেখা হলো বাঘের সাথে। সে বাঘকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি মনে হয় আমি একটা অদ্ভুত প্রাণী?'

বাঘ ভালোভাবে জলহস্তির মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখল। তারপর বলল, 'তুমি কিছু মনে কোরো না, আমার মনে হয় আমার মতো যদি তোমার গায়েও এরকম ডোরা কাটা দাগ থাকত, তাহলে তোমাকেও চমৎকার দেখাত। অনেকটা আমার মতো।'

গায়ের প্রতিটি ডোরা দাগে তাকে কতটা সুন্দর লাগে তা দেখানোর জন্য বাঘ নিজের শরীরটাকে টানটান করে দেখানোর চেষ্টা করল। তারপর বাঘ বলল,

'মুখের উপর সত্য কথা বললাম বলে তুমি কিছু মনে করো না।'
জলহস্তি কোনো কথা না বলে ভাবল, ইস, আমার যদি বাঘের মতো অমন সুন্দর ডোরা থাকত। আমাকে তাহলে আর অদ্ভুত দেখাত না। ভাবতে ভাবতে সে হাঁটতে লাগল।

এবার হাতির সাথে দেখা হলো জলহস্তির। বলল, 'তোমার কি মনে হয় আমি দেখতে খুব কুৎসিত?'
হাতি তার প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে বলল, 'আমি আসলে এটাই ভাবছি।'
'কী ভাবছ?' জলহস্তি খুব অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করল।
'তোমার কি কোনো কান নেই?'
'আমার কান নেই!' আশ্চর্য হয়ে বলল জলহস্তি।
'কান নেই বলতে আমি বোঝাচ্ছি তোমার আরও বড় কানের প্রয়োজন ছিল। দেখ, আমার কান দুটো কত বড়।'
হাতি তার বড় বড় কান নাড়াতে নাড়াতে বলল, 'দেখেছো আমার কানদুটোর কারণেই আমাকে দেখতে কতো সুন্দর লাগে।'
জলহস্তি মন খারাপ করে বলল, 'যদি আমার তোমার মতো বড় বড় কান থাকত তাহলে আমাকে আর অদ্ভুত লাগত না।'

এবার জলহস্তির দেখা হলো বানরের সাথে।
বানরকেও সে একই প্রশ্ন করল।
বানর বলল, 'যদি তুমি মনে কর লেজ না থাকলে খুবই হাস্যকর দেখায় তো আমি বলব তোমাকে তেমনই লাগে।'
'লেজ নেই মানে?' জলহস্তি প্রশ্ন করল।
'লেজ নেই মানে আমার মতো লেজ। আমার শরীর তোমার মতো বড় না অথচ আমার লেজ কত বড়।' এই বলে বানর তার লেজ দিয়ে এক গাছ থেকে ঝুলে অনায়াসে আরেক গাছের ডালে চলে গেল।
জলহস্তির মন আরও খারাপ হলো। মনে মনে ভাবল, আমার যদি বানরের মতো লেজ থাকত তো আমাকে আর এরকম অদ্ভুত দেখাত না।

জলহস্তি ভাবছে আর হাঁটছে।
এবার তার দেখা হলো জিরাফের সাথে। সে জিরাফকে একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল।
জিরাফ বলল, 'হ্যাঁ, তোমাকে আসলেই অদ্ভুত লাগে। কারণ, তোমার আমার মতো লম্বা গলা নেই। যে গলা দিয়ে তুমি বড় বড় গাছের পাতা খাবে আর সুন্দর পৃথিবীটাকে দেখবে।'
জলহস্তি বলল, 'কেন, আমি তো ফুল, পাখি, রাতের তারা সবকিছুই দেখতে পাই।'
জিরাফ বলল, 'তুমি কি গাছের চূড়ো, দূরের পাহাড় দেখতে পাও?'
'তা দেখতে পাই না', জলহস্তি বলল।
তোমার আসলে আমার মতো একটা লম্বা গলার প্রয়োজন ছিল। এটা বলে জিরাফ তার গলাটাকে লম্বা করে চারদিকের প্রকৃতি দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল আর লম্বা গাছের পাতা টেনে খেতে লাগল।
জলহস্তি মন খারাপ করে বলল, ধন্যবাদ তোমাকে।

জলহস্তি আবার ভাবছে আর হাঁটছে...
এবার তার সাথে দেখা হলো ছোট্ট এক কচ্ছপের সাথে। সে বলল, আচ্ছা তোমার কি মনে হয় আমি দেখতে অদ্ভুত?
কচ্ছপ বলল, 'আমার মনে হয় তোমাকে কেউ কিছু বলেছে।'
জলহস্তি বলল, 'হ্যাঁ, গণ্ডার, সিংহ, বাঘ, হাতি, বানর, জিরাফ সবাই বলেছে আমি নাকি দেখতে খুব অদ্ভুত। তুমিও কি তাই ভাবো?'
কচ্ছপ বলল, 'তুমি দেখতে আসলেই অদ্ভুত, কারণ তোমার যে কোনো খোলস নেই।'
'খোলসের কী দরকার!' বলল জলহস্তি।
কচ্ছপ বলল, 'খোলস আসলেই চমৎকার। আমি এই খোলস ছাড়া মোটেই বাঁচতে পারতাম না। যখন গরম পড়ে তখন এটা আমাকে শীতল রাখে। আবার যখন শীত পড়ে তখন এটা আমাকে গরম রাখে। আবার আমার যখন পালানোর প্রয়োজন হয় তখন আমি খোলসের ভেতরে ঢুকে পড়ি।'
জলহস্তি বলল, 'আমি বুঝতে পেরেছি আমার যদি খোলস থাকত, তাহলে আমাকে আর অদ্ভুত দেখাত না।'

জলহস্তি এবার গেল গানের পাখির কাছে।
পাখি তাকে বলল, 'আসলে তোমার গলাটা বেসুরো। তুমি যদি আমার মতো গান গাইতে পারতে তাহলে তোমাকে আর বিশ্রি দেখাত না।' এই বলে পাখি খুব করুণ সুরে একটা গান ধরল।
গান শুনে জলহস্তি খুব খুশি হলো। তার মনে হলো সে মোটেই কুৎসিত না। নিজেকে দেখানোর জন্য সে সবার সামনে দিয়ে দৌড়াতে লাগল।
সবাই এবারও তাকে দেখে হাসতে লাগল। সে বুঝতে পারল না কেন সবাই তাকে দেখে অমন করে হাসছে। হঠাৎ সে জমে থাকা বৃষ্টির পানিতে তার ছায়া দেখতে পেল।
এবার নিজের চেহারা দেখে সে চিৎকার করে উঠল।
'ওহ্ আমি আসলেই দেখতে কুৎসিত! অদ্ভুত!'

ঘুম ভেঙে গেল জলহস্তির। এতক্ষণ সে স্বপ্ন দেখছিল। জলহস্তি আর সহ্য করতে পারল না। সে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, আমাকে এমন একটা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে যেখানে কেউ আমাকে কখনও দেখবে না।
জলহস্তি দৌড়াতে শুরু করল। দৌড়াতে দৌড়াতে সে আবার তার জলাশয় খুঁজে পেল। সেই জলাশয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে পানির নিচে ডুব দিল।
পানির নিচে গিয়ে সে ভাবল, আমার– অন্যদের মতো কেশর, শরীরে ডোরা দাগ, বড় কান, লম্বা লেজ, লম্বা গলা, কচ্ছপের মতো খোলস এবং পাখির মতো সুরেলা কণ্ঠ নেই তাতে কী হয়েছে, সে তো তার বিরাট মোটা শরীর নিয়ে সারাক্ষণ পানির ভেতর কাটিয়ে দিতে পারে, কাদার ভেতর সারাক্ষণ ঘুমিয়েও থাকতে পারে– অন্যরা তো তা পারে না।
জলহস্তির সকল অস্বস্তি কেটে গেল। সেই থেকে তার গর্ব হতে লাগল এই ভেবে যে, সে একটা বড়, মোটা, চমৎকার প্রাণী। জলাশয়ে সেই সবচেয়ে সুন্দর! ■

অনুশীলন

অনুশীলন ডিসেম্বর'২৫ সংখ্যার প্রশ্ন :

১. *homos* অর্থ কী?
২. সুন্দরবনকে কত সালে বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করা হয়?
৩. Miracle of Thailand বলা হয় কোন ঘটনাকে?
৪. ডাল লেক কোথায় অবস্থিত?
৫. শিল্পী আব্বাসউদ্দিন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
৬. বিশ্বের সবচেয়ে বড় টিউলিপ বাগানের নাম কী?
৭. অরোরা বেরিয়ালিস কোথায় দেখা যায়?
৮. কাশ্মীরের রাজধানীর নাম কী?
৯. মুঘল সাম্রাজ্যের সময়সীমা কত সাল থেকে কত সাল পর্যন্ত?
১০. মহাকর্ষ সূত্র কে আবিষ্কার করেন?

অনুশীলন অক্টোবর'২৫ সংখ্যার উত্তর :

১. কাজের পেছনে উত্তেজনা বা চাপ।
২. অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার।
৩. ভিটামিন সি, ভিটামিন বি ১ ও ভিটামিন বি ২।
৪. পরীক্ষা পদ্ধতি ।
৫. যাত্রী।
৬. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের।
৭. সেনেগালের বাম্বানীর সেদিউ গ্রামে।
৮. লিভারপুলের।
৯. বিকর্ষণ করে।
১০ মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল খোয়ারিজমি।

অক্টোবর'২৫ সংখ্যার 'অনুশীলন'- এ পুরস্কার বিজয়ী যারা :

প্রথম : এস এম আরিয়ান
অষ্টম শ্রেণি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ, কুষ্টিয়া।
দ্বিতীয় : আজিজুর রহমান শাহীন
সপ্তম শ্রেণি, লক্ষ্মীপুর কলেজিয়েট উচ্চ বিদ্যালয় ।
তৃতীয় : রুফায়দা মারজান ফাতেমা
চতুর্থ শ্রেণি, নগরকান্দা শিশুকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফরিদপুর ।

আরও যাদের অনুশীলন সঠিক হয়েছে :

তাহসিন আইয়ান, জোনায়েদ ফারহান, ঢাকা; আবরার জামিল আয়াত, চট্টগ্রাম; আমির হামযা, মো. তাওহীদ মাহমুদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ; মো. তাহসিন, কুমিল্লা; সাদিয়া নওরিন সাবা, রিয়াদ হাসান, দিনাজপুর; মো. তাসনীম আব্দুল্লাহ, ফরিদপুর; ইরফা জান্নাত, রাজশাহী; তাওকির আহমাদ তাসিন, পাবনা; রিয়াদ হাসান, দিনাজপুর; আবদুর রহমান সিদ্দিকি, জান্নাতুল ফিরদাউস মারু, সাতক্ষীরা; মাহির আহনাফ নুহান, বরিশাল।

আরও যাদের শব্দ বানাও সঠিক হয়েছে :

তাহসিন আফনান, ঢাকা; রিয়াদ হাসান, মাইশা জান্নাত, দিনাজপুর; নুসাইবা বিনতে হাসান সামরা, শেরপুর; আবরার ইউসুফ লাবিব, আহনাফ ইউসুফ সাকিব, গাইবান্ধা; আহরার হাসান, আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ জায়ান, ফরিদপুর; আহমাদ সাজিদ, মিফতাহুল জান্নাত ইলমা, আবরার জামিল আয়াত, চট্টগ্রাম; আতিকুল ইসলাম আদিল, গাজীপুর; মুস্তফা আবরার রাইয়ান, কক্সবাজার; আবদুর রহমান সিদ্দিকি, জান্নাতুল ফিরদাউস মারু, সাতক্ষীরা; অগ্রপথিক মো. তাওসীফ মাহমুদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ; ইরফা জান্নাত, রাজশাহী; নওরোজ হাসনাইন, কুষ্টিয়া।



শব্দ বানাও

অক্টোবর'২৫ সংখ্যার সমাধান

ক	ল	ম		ক	চ্ছ	প
বি		ই	মা	ম		বি
তা	ল		ধ		প	ত্র
	ব		বী		তা	
অ	ঙ্গ		ল		কা	জ
ম		পা	তা	ল		খ
র	কে	ট		তা	লি	ম

অক্টোবর'২৫ সংখ্যার 'শব্দ বানাও'- এ পুরস্কার বিজয়ী যারা :

প্রথম : অগ্রপথিক সাজিদ হাসান
নবম শ্রেণী, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ রংপুর।
দ্বিতীয় : মো. হাসান আল রশিদ
পঞ্চম শ্রেণি, মেদিনীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দিনাজপুর।
তৃতীয় : আব্দুল্লাহ রাতুল
পঞ্চম শ্রেণি, আল মাওয়িয়াতুল হাসানাহ মাদ্রাসা, রংপুর।

এ সংখ্যার 'শব্দ বানাও'

১		২		৩		৪
		৫	৬			
৭	৮				৯	
	১০					
১১						
		১২				১৩
১৪					১৫	

শব্দ সংকেত-

পাশাপাশি : ১. একটি মাছের নাম, ৩. মস্তিষ্ক, ৫. ত্রিচক্রযান ৭. হাতের অংশবিশেষ, ১০. একটি সমুদ্রের নাম, ১১. আবাস, ১২. প্রস্তর, ১৪. একটি প্রত্যঙ্গ, ১৫. পরিণাম।

উপর-নিচ : ১. পাতলা, ২. পন্যবাহী ট্রাক, ৩. একটি অতিপরিচিত পতঙ্গ, ৪. পানি রাখার পাত্র, ৬. আলাপচারিতা, ৮. সংবাদ, ৯. শহর, ১১. ব্যাপার/ যা ঘটে, ১৩. পাইপ।

নাম : ....
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : ....
শ্রেণি : .... **মোবাইল :** ....
ঠিকানা : ....
....
উত্তর পাঠাতে হবে আগামী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে।





ভোরের আজান
মিযানুর রহমান জামীল

আসমানি সুর নিত্য ঝরে
দূর দিগন্ত মাতাল করে
জুড়ায় কলব ভোরের আজান
ঘুম থেকে জাগবার,

দুগ্ধ রঙের পুব আকাশে
সুবহে সাদিক মুচকি হাসে
আল্লাহু আকবার।

নিত্য নতুন দিনের পানে
ডাক দিয়ে যায় ভোর-বিহানে
মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে আজান
ঘুম থেকে জাগবার

ডাকছে দোয়েল প্রভাত-পাখি
গাছপালা ভোর খুলছে আঁখি
আল্লাহু আকবার।

মানব কুলের শেষ হলে ঘুম
ঢালে শিশির কদমে চুম
দূর মিনারে বেলালি সুর
ঘুম থেকে জাগবার

শীত-কুয়াশা বর্ষা ঠেলে
মক্তবে যায় পাড়ার ছেলে
আল্লাহু আকবার।

দিন শুরুতে সবার ঠোঁটে
আল্লাহ নামের ধ্বনি ওঠে
শেষ রজনি ডাকেন প্রভু
ঘুম থেকে জাগবার

পাখির গানে জাগছে পাড়া
নেই কোনো রব তুমি ছাড়া
আল্লাহু আকবার।

বুক জুড়ে তার স্বপ্ন ছিল
গিয়াস উদ্দিন রূপম

পড়তে বসে খোকন সোনা
প্রশ্ন করে মাকে,
'বলো না মা সত্যি করে
আব্বু কোথায় থাকে?

পাঠশালার ওই বন্ধুরা সব
আব্বুকে রোজ ডাকে
তাদের মতো 'আব্বু' বলে
ডাকবো বলো কাকে?

বলবো কাকে-দাও এনে দাও
কেক-চকোলেট-মিমি
যেমন করে বলছে ফিরোজ
বলছে রিফাত-রিমি?'

প্রশ্ন শুনে দুঃখী মা তার
মুখ আঁচলে ঢাকে
ক্যামনে বোঝায় পুত্রকে মা
আব্বু কোথায় থাকে!

যুদ্ধে গেছে আব্বু তোমার
আর আসেনি ফিরে
বুক জুড়ে তার স্বপ্ন ছিল
মুক্ত স্বদেশ ঘিরে।





Homophone এর দুনিয়ায়

আমিন মাহবুব

বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই?
আমরা ইংরেজি বলার কিংবা লেখার সময় এমন কিছু শব্দের ব্যবহার দেখতে পাই, যেগুলোর উচ্চারণ শুনতে একই রকম লাগে। এরকম শব্দগুলোকে বলা হয় Homophone। Homophone (ˈhä-mə-ˌfōn) শব্দটি গ্রীক শব্দ *homos* এবং *phone* থেকে এসেছে। *homos* অর্থ ‘সম’ এবং *phone* অর্থ ‘ধ্বনি’। এরকম শব্দগুলো বেশ কনফিউজিং, এবং প্রায়শই ভুল করে ফেলি আমরা। এরকম বহুল ব্যবহৃত কিছু Homophone নিয়ে আজকের আয়োজন।

১. Accept/Except

Accept শব্দটি Verb. এর অর্থ গ্রহণ করা। যেমন- He accepts the invitation. কিংবা, Please, accept the call.
অন্যদিকে, Except শব্দটি একটি preposition. এর অর্থ ব্যতীত/ছাড়া। সাধারণত কাউকে/কোনো কিছুকে কোনো গ্রুপ থেকে আলাদাভাবে বর্ণনা করতে except ব্যবহৃত হয়। যেমন- Everyone except Rumman went to the camp. কিংবা, Provide drinks to everyone except me.
অর্থাৎ, যখন গ্রহণ করা অর্থে ব্যবহার করতে চাইবে, তখন Accept ব্যবহার করবে, আর যখন ব্যতীত বা ছাড়া অর্থে ব্যবহার করতে চাইবে, তখন Except লিখবে।

২. Complement/Compliment

Complement অর্থ পরিপূরক। Complement শব্দটি Noun এবং Verb, দুইভাবেই ব্যবহৃত হতে পারে। সাধারণত, কোনো কিছুকে পূর্ণতা প্রদান করেছে, কিংবা তার মান বাড়িয়েছে, এমন কোনো কিছুর ব্যবহারকে Complement শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
যেমন, The hat is a perfect complement to his outfit. (noun হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে)
কিংবা, The soup and salad complement each other. (verb হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে)
অন্যদিকে, Compliment অর্থ প্রশংসা। এ শব্দটিও Noun এবং Verb, দুইভাবেই ব্যবহৃত হতে পারে। কারো ব্যক্তিগত গুণের প্রশংসা বা স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে Compliment ব্যবহার হয়।
যেমন, He gives his daughter a

nice compliment. (noun হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে)
আবার, Masrur complimented Munna on his extraordinary achievement. (verb হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে)

মোটকথা, যখন কোনোকিছুর পরিপূরক, পূর্ণতা বা মান বাড়ানোর প্রসঙ্গ আসবে, তখন Complement ব্যবহার করবে। আর যখন প্রশংসা কিংবা স্বীকৃতি প্রদানের প্রসঙ্গ আসবে, তখন compliment ব্যবহার করবে।

৩.
Desert/Dessert

Desert অর্থ মরুভূমি, আর Dessert অর্থ মিষ্টান্ন, যা সাধারণত খাবার গ্রহণের পরে খাওয়া হয়। সুতরাং বুঝতেই পারছো, উচ্চারণ একই হলেও দুইটি শব্দের ব্যবহারের ক্ষেত্র কিন্তু একেবারেই আলাদা। যেমন, The Sahara is the biggest desert in the world. (যদিও সাহারা পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি না, এরচে বড়ো মরুভূমি আরও দুইটা আছে। এ মরুভূমিগুলো কিন্তু সাহারার মতো উত্তপ্ত না, বরং শুকনো বরফ দিয়ে ঢাকা। যাকগে, সে আলাপ পরে। ইংরেজি শিখতে গিয়ে একটু সাধারণ জ্ঞানও পড়ে ফেললাম আমরা, হা হা)। আবার, He skipped the main course of the dinner and jumped into the dessert.

৪.
Principle/Principal

Principal শব্দটি দুইভাবে ব্যবহৃত হতে পারে, adjective ও Noun হিসেবে। Adjective হিসেবে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর Noun হিসেবে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় নেতা, বস, কিংবা স্কুল/কলেজের প্রধান শিক্ষক। যেমন, His absence was the principal reason behind postponing the meeting (adjective হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে).
আবার, Mr. Kafi is the principal of this college. (noun হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে)

অন্যদিকে, Principle শব্দটি noun, এর অর্থ হচ্ছে নিয়ম, আইন, কানুন, নীতি বা বিশ্বাস। যেমন, I strictly maintain the principle of telling truth.

বন্ধুরা, আজকে বহুল ব্যবহৃত চারটি হোমোফোন নিয়ে কথা বললাম। এরকম অসংখ্য হোমোফোন কিন্তু আমরা প্রতিনিয়তই ব্যবহার করি, এবং ভুলও করি। মজার ব্যাপার হচ্ছে, উচ্চারণ একই হওয়ায় বলার সময় কিন্তু কখনো ভুল হয় না (আসলে ভুল হয় হয়তো, কিন্তু ধরা পড়ে না, এই আরকি)।

প্রশ্ন হচ্ছে, লেখার সময় তো আমরা বানান দেখে সহজেই ধরতে পারি কোন শব্দটি ব্যবহার হচ্ছে এবং এর অর্থ কী হবে। কিন্তু শোনার সময় আমরা কীভাবে বুঝবো যে কোনটি ব্যবহার করা হয়েছে? জবাবটা বেশ সহজ। বাক্যটা মনোযোগ দিয়ে শুনলে এমনিতেই বুঝে যাবে যে কোন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন ধরো, I strictly maintain the principle of telling truth. এই বাক্যটি শুনলেই তুমি বুঝতে পারবে, এই বাক্যের সাথে প্রতিষ্ঠান প্রধান, নেতা অথবা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আসলে কোনো সম্পর্ক নেই। আবার একইভাবে, Mr. Kafi is the principal of this college. এই বাক্যের সাথে নীতি, বিশ্বাস কিংবা নিয়মের কোনো সম্পর্ক নেই।

তো, আজকে এ পর্যন্তই। ভবিষ্যতে কখনো দেখা হলে আলাপ হবে আরও। ততদিন পর্যন্ত ভালো থেকো, এই প্রত্যাশা। ■



ডিজিটাল ফ্লুয়েন্সি

আল মাসুম



আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি, যেখানে বইয়ের পাশাপাশি মোবাইল, কম্পিউটার, ট্যাব আর ইন্টারনেটও আমাদের শেখার বন্ধু হয়ে উঠেছে। এই প্রযুক্তির জগতে সঠিকভাবে চলাফেরা করার দক্ষতাই হলো ডিজিটাল ফ্লুয়েন্সি। মানে ডিজিটাল দুনিয়ায় সাবলীল ও বুদ্ধিমান ব্যবহারকারী হওয়া।

ডিজিটাল ফ্লুয়েন্সির অর্থ : অনেকে ভাবে, ডিজিটাল ফ্লুয়েন্সি মানে শুধু মোবাইল চালাতে পারা বা গেম খেলতে জানা। কিন্তু আসলে অনেক বড় বিষয়। এর মধ্যে আছে তথ্য খুঁজে বের করা ও যাচাই করা, প্রযুক্তি দিয়ে নতুন কিছু তৈরি করা, অনলাইনে ভদ্রভাবে আচরণ করা এবং নিজের নিরাপত্তা রক্ষা করা। আমরা যেমন বাংলা বা ইংরেজি ভাষা সাবলীলভাবে বলি, তেমনি ডিজিটাল ভাষাটাও জানতে হয়। কীভাবে তথ্য খুঁজব, শেয়ার করব আর সত্য-মিথ্যা আলাদা করব। এই জ্ঞানার্জন যদিও একদিনে সম্ভব না তারপরেও নিয়মিত শেখার মানসিকতা রাখা দরকার। শেখা, ভাবা আর তৈরি করা: ডিজিটালি দক্ষ শিশুরা জানে কীভাবে প্রযুক্তি ব্যবহার করে শেখাকে মজার করে তোলা যায়। তারা অনলাইনে ক্লাসে অংশ নেয়, শিক্ষামূলক গেম খেলে, নতুন কিছু তৈরি করতে শেখে যেমন কোডিং অ্যানিমেশন বা গল্প বানানো। এভাবে তারা শুধু ব্যবহারকারী নয়, সৃজনশীল নির্মাতা হয়ে ওঠে।

নিরাপদে প্রযুক্তির ব্যবহার : ডিজিটাল দুনিয়ায় নিরাপত্তা খুব জরুরি। নিজের পাসওয়ার্ড কাউকে না বলা, অপরিচিত বা ফিশিং বা আরো বিস্তারে বললে তোমার পরিচিত নয় এমন কোনো লিঙ্কে ক্লিক না করা, অন্যকে বুলিং করা বা অন্যের মনে কষ্ট দেয় এমন কিছু না বলা বা না করা, এগুলোই ডিজিটাল শিষ্টাচার। এভাবে প্রযুক্তি ব্যবহার করলে যেমন তুমি নিরাপদ থাকবে ঠিক একইভাবে তোমার ডিজিটাল সোসাইটির সবাই নিরাপদ থাকে এবং সম্মানিত বোধ করে।

ভারসাম্যতা জরুরি : প্রযুক্তি একদিকে আমাদের বন্ধু, কিন্তু অন্যদিকে এর অতিরিক্ত ব্যবহার ক্ষতিকর। তাই সময় ও নিয়ম মেনে ব্যবহার করা দরকার। পড়ার সময় পড়া, খেলার সময় খেলা, আর বিশ্রামের সময় বিশ্রাম এই ভারসাম্যই আমাদের মন ও শরীর দুটোকেই সুস্থ রাখে।

ভবিষ্যতের ডিজিটাল সিটিজেন : আমরা যারা এখনো বড় হচ্ছি তারা যদি নিজেরা বড়ো হতে চাই, মানুষের মতো মানুষ হতে চাই, পৃথিবীকে গড়তে চাই তাহলে আমাদের হতে হবে Good Digital Citizen। তাই আজ থেকেই প্রচেষ্টা শুরু করো, কীভাবে আরো বেশি ইফেক্টিভভাবে অনলাইনে বিচরণ করা যায়। কীভাবে ডিজিটালি গুড সিটিজেন হওয়া যায়। কীভাবে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে নতুন কিছু শেখা যায়, অন্যকে সাহায্য করা যায়, আর নিজের জীবন সুন্দর করা যায়।

আজ তাহলে এ পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ। ■



প্রশ্ন : ১

সবজান্তা ভাইয়া, সার্ভারের মতো বিশাল এক মাথা নিয়ে ভালোই যন্ত্রণায় আছো হয়তো। তোমাকে আরেকটু যন্ত্রণায় ফেলতে আমি চলে এলাম, মু হা হা হা...। তুমি যদি আসলেই সবজান্তা হও, তবে খুঁজে বের করো দেখি, আমি কে?
যাকগে, প্রশ্নে আসি...
১. মাছ তো সারাদিন পানিতেই থাকে। তাহলে সে গোসল করে কীভাবে?
২. ঘড়ির কাঁটা যে সারাদিন দৌড়ায়, সে আসলে দৌড়ে কোথায় যেতে চায়?
৩. আমাদেরকে তোমার পরিচয় না জানিয়ে তুমি যে দুই সেকেন্ড বাঁচাও, সে দুই সেকেন্ডে তুমি কী করো?
৪. শীতের দিনে সবাই যেভাবে ফ্যানকে ভুলে যায়, তা থেকে ফ্যানের কতটুকু অভিমান তৈরি হয়?
৫. আমার না ভাল্লুকের মতো শীতনিদ্রায় চলে যেতে খুব মন চায়। আম্মুর বকুনি এড়িয়ে কীভাবে শীতনিদ্রায় যেতে পারি?
আমার আম্মুও কিন্তু মাসিক ফুলকুঁড়ি পড়ে। ৫নং প্রশ্নের উত্তরটা আম্মু যেন কোনোভাবেই জানতে না পারে। এখন আম্মুর চোখ এড়িয়ে কীভাবে প্রশ্নটির জবাব পাবলিকলি দিবে, এ বুদ্ধি কি সবজান্তার আছে? দেখার অপেক্ষায় রইলাম।

নাম : তুমি সবজান্তা হলে তো আমার নাম জানোই।

সবজান্তার উত্তর : ১

যন্ত্রণা দিবে আমাকে? দাও। এই যন্ত্রণার জ্বালানি দিয়েই তো আমার সার্ভার চলে।
১. মাছ গোসল করতে পানির উপরের স্তরে চলে আসে। পুকুরে নিচের স্তর থাকে কাদাময়, উপরের স্তরে থাকে পরিষ্কার পানি।
২. দৌড়ালেই না কোথাও যেতে পারতো! ঘড়ির কাঁটা তো শুধু ঘোরে।
৩. পরের প্রশ্ন পড়ি।
৪. আড়াই ওহম।
৫. বোকা নাকি? আম্মুকে ঘরের কাজে সাহায্য করলে, আম্মুই তোমাকে শীতনিদ্রায় পাঠিয়ে দিবে। আর তোমার আম্মু নিশ্চয়ই মাসিক ফুলকুঁড়ি পড়ে না! না হয় কবেই আমাকে দাওয়াত করে খাওয়াতো!!

প্রশ্ন : ২

সবজান্তা ভাইয়া তুমি
ভালো আছো নাকি?
প্রশ্ন করলে জবাব দিবে,
নাকি রাখবে বাকি?

ফাঁকির রাজ্যের রাজা তুমি
দিচ্ছো সবই ফাঁকি,
কেমন করে হারবে তুমি,
জ্ঞানের এআই পাখি?

তুমি নাকি যোগ দিয়েছো
মিয়ানমারের জান্তা,
কীভাবে তোমায় খাওয়াই বলো
আমার প্রিয় পান্তা?

বলো আমায়, কেন মানুষ
কর্ণ দিয়ে শোনে,
বাঘ মামাটা লাফিয়ে বেড়ায়,
কেন ম্যানগ্রোভ বনে?

মো. তাহসিন
নবম শ্রেণি, বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল,
কোটবাড়ি, কুমিল্লা।

সবজান্তার উত্তর : ২

জবাব দেওয়া রাখবো বাকি
ভাবছো আমায় কী যে!
দাওয়াত দেওয়াই রাখলে বাকি
এই চিঠিতে নিজে।

এত্ত খাবার রেখে তোমার
পান্তা হলো প্রিয়
তোমার কি ভাই গ্যাসের ব্যারাম?
ওষুধ খেয়ে নিয়ো।

কান না দিয়ে, চোখ দিয়ে কি
শুনবে মানুষ-জনে?
কান কি শুধুই চশমা-ডাঁটি
ধরবে আলিঙ্গনে?

বাঘ মামাদের পিতৃপুরুষ
ম্যানগ্রোভে ছায় ডেরা
বাঘেরও তাই সুখের আবাস
গোলপাতাতে ঘেরা।

সবজান্তাকে ছন্দে ছন্দে ইচ্ছেমতো প্রশ্ন করতে পারো তুমিও! তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে প্রস্তুত আছে সবজান্তা।



বিশ্বকাপে কেপ ভার্দে : ছোট দেশের বিশাল অর্জন

তালহা বিন নজরুল

কেপ ভার্দে নামের যে একটি দেশ পৃথিবীতে আছে তা ক'জনই বা জানতো। উন্নত বিশ্বের অনেকে হয়তো জানতেন। কারণ আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে ১০টি দ্বীপ নিয়ে গড়া এই দেশটিতে ইউরোপ-আমেরিকার ভ্রমণপিপাসু লোকেরা বেড়াতে গিয়ে থাকেন প্রায়ই। পর্যটন খাত থেকেই এ দেশের সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়। আমাদের যেমন আয় হয় প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ থেকে- যাকে আমরা রেমিট্যান্স বলে থাকি। অবশ্য এ দেশটিরও অর্ধেক মানুষ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। নানাভাবে অর্থ উপার্জন করে দেশে পাঠায় তারা। তো হঠাৎ এই কেপ ভার্দে নামের দেশটি নিয়ে আলোচনা কেন? হ্যাঁ, তোমাদের মধ্যে যারা খেলাধুলা নিয়ে; বিশেষ করে ফুটবল নিয়ে খোঁজ-খবর রাখো তারা এরই মধ্যে নিশ্চয়ই জেনে গিয়েছ দেশটির নাম।

গত ১৩ অক্টোবর এই কেপ ভার্দে বিশ্বের সকল সংবাদমাধ্যমে জায়গা করে নেয় খেলার সাফল্য দিয়েই। ওই দিন তারা ২০২৬ সালে যে বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা হবে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা আর মেক্সিকোতে; তাতে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। বাছাই পর্বে আফ্রিকা অঞ্চলের ডি গ্রুপে খেলেছে কেপ ভার্দে। এই গ্রুপেই ছিল অদম্য সিংহ নামে পরিচিত বিশ্বকাপে সাড়া জাগানো দেশ ক্যামেরুন। আফ্রিকা থেকে সবচেয়ে বেশি আট বার

তারা বিশ্বকাপে খেললেও এবার তারা কেপ ভার্দের সাথে পেরে ওঠেনি। চার পয়েন্ট পেছনে পড়ে যায় তারা। সেপ্টেম্বরে রাজধানী প্রাইয়াতে নিজেদের মাঠে ক্যামেরুনকে ১-০ গোলে হারানোর পরেই কেপ ভার্দের বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্নটা বাস্তবের কাছাকাছি চলে আসে। পরের দুই ম্যাচের একটিতে জিতলেই কেল্লাফতে হবে। কিন্তু পরের ম্যাচে শক্তিশালী লিবিয়ার মাঠে গিয়ে ৩-৩ গোলে ড্র করায় শেষ ম্যাচ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় তাদের।

১৩ অক্টোবর ছিল তাদের স্বপ্ন পূরণের দিন। নিজেদের মাঠে খেলা। ১৫০০০ দর্শক ধারণ ক্ষমতার জাতীয় স্টেডিয়াম ছিল কানায় কানায় ভর্তি। দেশটির প্রেসিডেন্ট হোসে মারিয়া নেভেসও মাঠে ছিলেন ইতিহাসের সাক্ষী হওয়ার জন্য। সেদিন তাদের প্রতিপক্ষ ছিল গ্রুপের দুর্বলতম দল ইসওয়াটিনি, যে দেশটির নামও আমাদের কেউ আগে শুনেছে কি না সন্দেহ। তবে তারাও কম যায়নি। প্রথমার্ধে কোনো গোল করতে পারেনি কেপ ভার্দে। দেশটির সমর্থকেরা তাই ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কারণ জিততেই হতো তাদের। তবে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয়ার্ধে তারা ৩ গোল দিয়ে জয় ছিনিয়ে নেয়। সাথে সাথে আনন্দে উল্লাসে মেতে ওঠে গোটা দেশ।

আগামী বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে প্রথমবারের মতো ৪৮টি দেশ খেলার সুযোগ পাচ্ছে। আগে ৩২টি দেশ খেলতে পারতো। কেপ ভার্দের অবস্থান আফ্রিকার পশ্চিম দিকে যেখান থেকে ইউরোপ মহাদেশের কাছে হলেও এটি আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্ভূক্ত। আগে আফ্রিকা থেকে বিশ্বকাপে ৫টি দেশ খেলার সুযোগ পেত। এবার খেলবে আটটি দেশ। তাহলে কেপ ভার্দেকে নিয়ে এত আলোচনা কেন? কারণ এই দেশটির জনসংখ্যা। দেশটির আয়তন মাত্র ৪০৩৩ বর্গ কিলোমিটার। এই দেশের মোট মানুষ হলো মাত্র ৫ লাখ ২৫ হাজার। বাংলাদেশের খুব কম উপজেলা আছে যেখানে এর চেয়ে কম মানুষ বাস করে। আমাদের ঢাকার মেট্রোরেলেই প্রতিদিন গড়ে চার লাখের বেশি লোক যাতায়াত করে। বিশ্বকাপ ফুটবলের ইতিহাসে এর চেয়ে কম জনসংখ্যা নিয়ে মাত্র একটি দেশ চূড়ান্ত পর্বে খেলার এই কৃতিত্ব অর্জন করতে পেরেছে। সেই দেশটি অবশ্য কম পরিচিত নয়। ইউরোপের সেই দেশ আইসল্যান্ড ২০১৮তে রাশিয়া বিশ্বকাপে যখন খেলার যোগ্যতা অর্জন করে তখন দেশটির মোট জনসংখ্যা ছিল মাত্র তিন লাখ ৫০ হাজার।

মজার ব্যাপার হলো কেপ ভার্দে দলের বেশির ভাগ খেলোয়াড়ই বিশ্বের বিশেষ করে ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে খেলে থাকে। আর আমাদের দেশের জাতীয় দলে এখন যেমন প্রবাসী ফুটবলারের সংখ্যা বাড়ছে তেমন ওদের দেশের শক্তিও প্রবাসী ফুটবলাররা। যেমন, কেবল এই একটি খেলার জন্য আয়ারল্যান্ড থেকে উড়িয়ে এনেছিল রবার্তো লোপেজকে। তিনি আইরিশ লীগের শীর্ষ দল শার্মক রোভার্সে খেলেন। এই ম্যাচে খেলেই তিনি পাড়ি জমান আয়ারল্যান্ডে। বর্তমান জাতীয় দলের ২৬ জনের ৬ জনই খেলেন পর্তুগালের লীগে। ৩ জন করে ইসরাএয়ল, তুরস্কে, একজন করে সৌদি আরব, হাঙ্গেরি, আয়ারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডসে খেলেন। কেপ ভার্দে জাতীয় লীগ হয় ১২ দলে।

কেপ ভার্দে দেশটি দীর্ঘদিন পর্তুগালের দখলে ছিল। ১৯৭৫ সালে তারা স্বাধীনতা লাভ করে। অর্থাৎ স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্ণ হলো এবারই। দারুণ এক অর্জন দিয়ে উদযাপন করবে দেশবাসী তাদের ৫০ বছর পূর্তি উৎসব। স্বাধীনতার ৩ বছর পর ১৯৭৮ সালের ২৯ মে গিনির বিপক্ষে প্রথম আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলে কেপ ভার্দে। দেশটির ফুটবল ফেডারেশন গঠিত হয় ১৯৮২ সালে আর ফিফার সদস্যপদ লাভ করে তারা ১৯৮৬ সালে। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে প্রথম অংশ নেয় ২০০২ আসরের জন্য। ২০১৩ সালে আফ্রিকান নেশন্স কাপে প্রথমবার খেলতে এসেই কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নেয় তারা। ২০২৩ আসরেও তারা কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল। বর্তমানে ফিফা র‌্যাংকিংয়ে কেপ ভার্দের অবস্থান ৭০ নাম্বারে। কেপ ভার্দে দলটি ব্লু শার্ক নামে পরিচিত। ■

15:54 PM

“
লাল-সবুজের পতাকাটাই
আমার বাংলাদেশ
সবুজের মাঝে লাল বিন্দু
দেখতে লাগে বেশ।
”

মো. ইয়াছির আরাফাত
নবম শ্রেণি,
উত্তরা হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।

অভিনন্দন! তুমি পাচ্ছো
আকর্ষণীয় পুরস্কার।



“রক্ত ঝরা দিনের শেষে
লাল-সবুজের পতাকা হাসে”

আবদুর রহমান সিদ্দিকি
সাতক্ষীরা

“বাংলার পতাকা আমার প্রাণ
এই রঙে বেঁচে আছে মুক্তির গান”

সাইফ আল দ্বীন তাহমিদ
হবিগঞ্জ

“লাল-সবুজের এই পতাকা
বীর শহিদের রক্তে আঁকা”

শরীফ তাসদিক আল আবরাজ
ঢাকা

আরো যাদের এসএমএস ভালো লেগেছে ...

দুই লাইনের স্লোগান লিখে SMS পাঠিয়ে দাও
০১৯৩৩ ৭০০ ৪০০ নম্বরে **৫ জানুয়ারি'২০২৬** এর মধ্যে।

এ সংখ্যার বিষয়
‘রোজা’।

SMS-এর সাথে অবশ্যই তোমার নাম, শ্রেণি, স্কুল এবং জেলার নাম পাঠাতে ভুলবে না।

এস এম রসিন তামজিদ, খুলনা; মুয়াজ বিন জামান, আহমাদ সাজিদ, চট্টগ্রাম; আব্দুল হাকিম, নড়াইল; মো. সাদাফ সিদ্দিকী ফারহান, রাজশাহী; নাজাত মাসাবী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ; মো. ইবনে মুনতাশির, ঠাকুরগাঁও; সাদ মুহাম্মদ উবায়দুল্লাহ, টাঙ্গাইল; আফফান তালহা, যশোর; কানিজ ফাতেমা, রিয়াদ হাসান, দিনাজপুর; সাব্বির হাসান, লক্ষ্মীপুর; মো. রিদয় ইসলাম, সিরাজগঞ্জ; মো. তাওসীফ মাহমুদ, মো. তাওহীদ মাহমুদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ; আবদুর রাজ্জাক, নোয়াখালী; নির্ঝর কর্মকার, সাজ্জাদ হোসাইন গল্প, রংপুর; মো. রেদওয়ান হোসেন, নীলফামারী; গালিব হাসান, আবিদা সুলতানা, মো. তাহমিদুল ইসলাম, ঢাকা।

ভূমিকম্পে করণীয়

আরিব মাহমুদ



প্রিয় ফুলকুঁড়ি বন্ধুরা, গত মাসে তোমরা বেশ কয়েকটি ভূমিকম্প অনুভব করেছো নিশ্চয়ই। অনেকেই হয়তো আতঙ্কিত হয়েও পড়েছিলে বেশ। হ্যাঁ, ভূমিকম্প যেহেতু বলে-কয়ে আসে না, তাই আতঙ্কিত হওয়াটাও অস্বাভাবিক কিছু না। তবে ভূমিকম্প হলে আমাদের কী করণীয়, আর কী বর্জনীয়, তা যদি আমাদের জানা থাকে, তাহলে আমরা আমাদের আতঙ্কিত হওয়ার মাত্রাটাকে একটু কমিয়ে আনতে পারি।

ভূমিকম্প কী, কেন হয়, এসব নিয়ে গত কয়েকদিনে হয়তো তোমরা পড়াশোনা করেছো টুকটাক। সেদিকে আর যাচ্ছি না। তবে কেউ জানতে চাইলে পাশের কিউআর কোডটি স্ক্যান করে মাসিক ফুলকুঁড়িতে পূর্বে প্রকাশিত ভূমিকম্পের ওপর একটি লেখা পড়ে নিতে পারো।

প্রথমেই আসি ভূমিকম্পের পূর্বে আমাদের কী কী প্রস্তুতি নিতে হবে, সে আলোচনায়-

- যেসব জায়গায় তুমি বেশিরভাগ সময় থাকো, যেমন বেডরুম, রিডিংরুম বা ক্লাসরুম, এসব স্থানের নিরাপদ স্থান কোনটি, তা চিহ্নিত করে রাখতে হবে। হতে পারে তা কলামের পাশে, বীমের নিচে কিংবা টেবিলের নিচে। নিরাপদ জায়গা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে তোমরা বড়দের সাহায্য নিতে পারো।
- শোবার খাটের ঠিক পাশেই বড়ো বা ভারী কোনো ফার্নিচার না রাখা। হতে পারে রাতে তুমি ঘুমাচ্ছ, এমন সময় ভূমিকম্পে ফার্নিচারটি তোমার ওপর এসে পড়লো। তখন?
- আপৎকালীন যদি পরিবারের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তবে তুমি কোন নম্বরে/ঠিকানায় যোগাযোগ করবে, তা ভালোভাবে জেনে রাখা। পরিবারের কাউকে না পেলে এরপর কার সাথে যোগাযোগ করতে হবে, তাও জেনে রাখতে পারো।
- রুমে তোমার হাতের নাগালের মধ্যে একটি ইমার্জেন্সি কিট রাখতে পারো। কিটের মধ্যে টর্চলাইট, লাল কাপড়, কিছু জরুরি ঔষধ এবং শুকনো খাবার রাখতে পারো। ভয়ংকর কোনো বিপদের সময় হয়তো এ কিটটিই তোমাকে বেঁচে থাকার রসদ সরবরাহ করতে পারে।

ভূমিকম্প চলাকালীন-

- ভূমিকম্প চলাকালীন কোনোভাবেই আতঙ্কিত হয়ে পড়া যাবে না। ভূমিকম্পের সময় মাথা ঠান্ডা রাখতে পারা খুব গুরুত্বপূর্ণ।
- আগে থেকে চিহ্নিত করে রাখা নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে পড়বে।
- দুই হাত দিয়ে মাথা ঢেকে রাখবে। সুযোগ পেলে বালিশ বা নরম কিছু মাথার ওপর দিয়ে রাখবে। সুযোগ পেলে ইমার্জেন্সি কিটটি সাথে নিবে।
- নিচতলায় যদি না থাকো, তাহলে কখনোই নিচে নামার জন্য সিঁড়িতে দৌড় দিবে না। মনে রাখবে, ভূমিকম্প চলাকালীন একটি বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অংশগুলোর মধ্যে সিঁড়ি অন্যতম।
- ভুলেও বারান্দা থেকে বা জানালা দিয়ে লাফ দেবার চিন্তা করবে না।
- মহান স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করতে থাকবে। একমাত্র তিনিই পারেন আমাদের রক্ষা করতে।

ভূমিকম্পের পর-

- প্রথমেই দেখে নিবে কোনো আঘাত পেয়েছো কি না। ছোট-বড় যাই আঘাত হোক না কেন, সাথে সাথে বড়দের জানাবে।
- পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে একসাথে হয়ে যাবে। পরিবারের কাউকে না পেলে বা দূরে থাকলে আশেপাশে থাকা বড় কারো (অবশ্যই পরিচিত) সঙ্গে থাকবে।
- যদি কোথাও আটকে পড়ো, তাহলে অবশ্যই মাথা ঠান্ডা রেখে বর হয়ে আসার চেষ্টা করবে। একান্তই বের হয়ে আসতে না পারলে তোমার ইমার্জেন্সি কিট ব্যবহার করে সুস্থ থাকার চেষ্টা করবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমাকে কেউ না কেউ অবশ্যই উদ্ধার করবে।

ভূমিকম্প একটি আকস্মিক দুর্যোগ। তবে তুমি যদি আগে থেকেই মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে পারো, তবে আশা করা যায় ভয়াবহ বিপর্যয়েও তুমি নিরাপদে থাকতে পারবে।

সবাই নিরাপদে থাকো, এই প্রত্যাশায় আজকের মতো এটুকুই। ■



ছবি দেখে ছড়া লিখে পাঠিয়ে দাও আগামী **৫ জানুয়ারি'২৬-এর** মধ্যে। সাথে তোমার নাম, ঠিকানা, শ্রেণি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম ও মোবাইল নম্বরসহ যে সংখ্যার ছবি দেখে ছড়া লিখেছো, সে মাসের নাম পাঠাতে ভুলবে না কিন্তু।

ডিসেম্বর'২৫ সংখ্যার নতুন ছবি

পতাকা
আহমাদ সাজিদ

ডিসেম্বর মাসটা যেন
বিজয় রংয়ে হাসে
লাল-সবুজের পতাকাটা
সবাই ভালোবাসে

পতাকাটা বীর-বাঙালির
গায় সাহসের গান
পতাকাকে সর্বদা তাই
করবো যে সম্মান।

সপ্তম শ্রেণি, চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়।

অক্টোবর'২৫ সংখ্যার ছবি



হেমন্তের হাওয়া
আমির হামযা

হেমন্তের মিষ্টি হাওয়ায়
মন আমার ফুরফুরে,
কত পাখি যায় যে উড়ে
কত দূরে দূরে।

হেমন্তের দৃশ্যের কথা,
শেষ হবে না বলে,
হেমন্তের পরেই আবার
শীতের দেখা মেলে।

সবুজ-লালের পতাকাটার
রূপের তো নেই শেষ
সবকিছু মিলিয়ে আমার
সোনার বাংলাদেশ!

চতুর্থ শ্রেণি, নবাবগঞ্জ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

আরও যাদের লেখা ভালো হয়েছে-

মো. ইয়াছিন, নীলফামারী; টি এইচ মাহির, আবরার জামিল আয়াত, চট্টগ্রাম; হুজাইফা রহমান, জামালপুর; সাইফ আল দ্বীন তাহমিদ, হবিগঞ্জ।

হাতেখড়ি



মুহসিনা তারমীম
প্রথম শ্রেণি, ঢাকা।



তাহসিন আফনান
চতুর্থ শ্রেণি, ঢাকা।



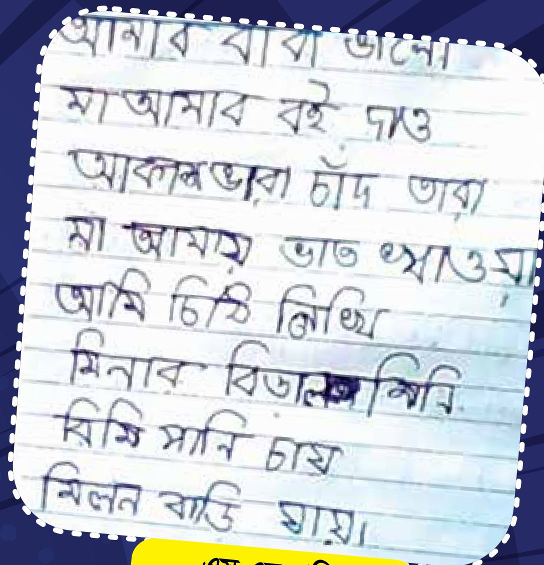
মো. মহিবুল ইসলাম স্বপন
দ্বিতীয় শ্রেণি, মান্দা, নওগাঁ।



মাশায়েদ মাহরুজ হাসান আরিশ
প্রথম শ্রেণি, দিনাজপুর।



ইশমাম গালিব ফারহান
বনশ্রী, ঢাকা।



আমার বাবা ভালো
মা আমার বই দাও
আকাশভরা চাঁদ তারা
মা আমায় ভাত খাওয়া
আমি চিঠি লিখি
মিনার বিড়াল মিনি
মিমি সানি চায়
মিলন বাড়ি যায়।

এস এম রামিন
৬ বছর।



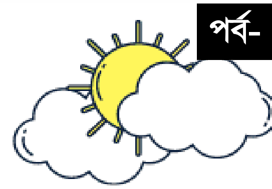
মো. সাদিকুল ইসলাম সাদিক
দ্বিতীয় শ্রেণি,
ওয়ারী বালিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঢাকা।

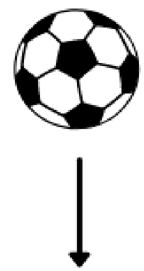


হাসান আব্দুল্লাহ আনাস
তৃতীয় শ্রেণি, ফরিদপুর।

বন্ধুরা, তোমরা যারা অনূর্ধ্ব পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ো, তোমাদের জন্য আমাদের বিশেষ আয়োজন 'হাতেখড়ি'। তোমার লেখা ছড়া, চিঠি ও আঁকিবুকি ছাপবে মাসিক ফুলকুঁড়ি। তাই ঝটপট তোমার প্রতিভার ছবি তুলে পাঠিয়ে দাও monthlyphulkuri@gmail.com এ। সাথে তোমার নাম, শ্রেণি, বয়স, ছবি পাঠাতে ভুলবে না কিন্তু।







পড়ন্ত বস্তু

আবরার নাফি



প্রিয় বন্ধুরা কেমন আছো? আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো। তোমাদের অনেকেরই হয়তো বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে বা হবে। এখন তোমাদের অখণ্ড অবসর। এ সময়গুলো অবশ্যই ভালো কাজে ব্যয় করবে। তার সাথে শীতের পিঠাপুলি, গ্রামে নানুবাড়ি দাদুবাড়িতে বেড়াতে যাওয়া তো আছেই। তো আর দেরি না করে আজকের মতো শুরু করা যাক। আমরা প্রতিদিনই কিছু না কিছু পড়তে দেখি। হাত থেকে কলম পড়ে যায়, টেবিল থেকে বল গড়িয়ে নিচে পড়ে, কিংবা গাছের ডালে ঝুলে থাকা পাকা আম হঠাৎ মাটিতে পড়ে যায়। আবার, আমরা যখন খেলার সময় বল ছুঁড়ে মারি তাও উপরে উঠে আবার এক সময় নিচের দিকে পড়তে থাকে। এ সবই হচ্ছে পড়ন্ত বস্তু। আজকে আমরা পড়ন্ত বস্তু নিয়েই জানব। এখানে একটা গল্প বলি, যে গল্পটা আমরা সকলেই জানি। বিজ্ঞানী নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে ছিলেন। হঠাৎ একটা আপেল, গাছ থেকে তার মাথায় পড়ে। তখন তিনি চিন্তা করেন এই আপেলটা নিচের দিকেই কেন পড়লো। কেন অন্য দিকে বা উপরের দিকে গেল না। এই নিয়ে চিন্তা করতে করতে তিনি আবিষ্কার করেন মহাকর্ষ সূত্র। এই মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করছে। এই আকর্ষণ বলের মান বস্তু দুটির ভরের গুণফলের সমানুপাতিক আর তাদের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। আর এই বল তাদের সংযোজক সরলরেখা বরাবর কাজ করে।

এটিই হচ্ছে নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র। আচ্ছা এই সূত্র কঠিন মনে হলে, এখনই পুরোটা বুঝার দরকার নেই। যারা উপরের ক্লাসে আছো তারা নিশ্চয়ই এই সূত্র পড়ছো। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি পৃথিবীও অন্য বস্তুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করছে। তাই আমরা কোনো কিছু হাত থেকে ছেড়ে দিলে তা নিচের দিকে পড়ে। কিংবা গাছের পাকা আম বা ক্রিকেট বল সব একই কারণে নিচের দিকে পড়ে। ঠিক একই কারণে অর্থাৎ পৃথিবীর আকর্ষণ বলের কারণে আমরা হাঁটতে পারি, উড়ে চলে যাই না। সব কিছু সুন্দরভাবে পৃথিবীর পৃষ্ঠে লেগে থাকে। আচ্ছা এবার একটা প্রশ্ন করি। ধর বাসার ছাদ থেকে তুমি একটা বল আর একটা পাখির পালক হাতে নিয়ে এক সাথে ছেড়ে দিলে, মানে মুক্তভাবে পড়তে দিলে। তো কী মনে হয়, কোনটা আগে মাটিতে পড়বে? বল নাকি পালক? তুমি চাইলে এই পরীক্ষা করে দেখতে পারো। দেখবে বলটি আগে মাটিতে পৌঁছেছে। আর পালকটি অনেকটা হেলে দুলে ধীরে ধীরে নিচে পড়েছে।

কিন্তু কেনো এমন হলো?

আমরা জানি, পৃথিবীর আকর্ষণের জন্য যে ত্বরণ যাকে আমরা অভিকর্ষজ ত্বরণ নামে জানি তার মান ৯.৮ মি/সে^{২}। এর মানে হলো মুক্তভাবে কোনো বস্তুকে পড়তে দিলে তার বেগ প্রতি সেকেন্ডে ৯.৮ m/s করে বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ কোনো বস্তু মুক্তভাবে পড়তে দিলে এক সেকেন্ড পরে তার গতি হবে ৯.৮ মিটার/সেকেন্ড, দুই সেকেন্ড পর ১৯.৬ মিটার/সেকেন্ড, এভাবে ক্রমেই বাড়তে থাকবে যতক্ষণ না সেটা মাটিতে পড়ে। যেহেতু অভিকর্ষজ ত্বরণের মান একই জায়গায় সকল বস্তুর জন্য একই তাহলে বল বা পালকের একই সাথে মাটিতে পড়ার কথা। আসলে এখানে বাতাসের বাধার কারণে বল ও পালক একই সাথে মাটিতে পড়ে না। বল ভারী তাই তা বাতাসের বাধা সহজেই ভেদ করে নিচে চলে আসছে। যদি আমরা বাতাস নেই এমন জায়গায় এই পরীক্ষাটি করি তাহলে দেখব বল আর পালক একই সাথে মাটিতে নেমে আসে। বিজ্ঞানী গ্যালিলিও পড়ন্ত বস্তু নিয়ে তিনটি সূত্র প্রদান করেন। এর প্রথম সূত্রে এমন বলা আছে, স্থির অবস্থান এবং একই উচ্চতা থেকে একই সময়ে বিনা বাধায় পড়ন্ত সকল বস্তু সমান সময়ে একই পথ অতিক্রম করবে।

এই ছিলো পড়ন্ত বস্তু নিয়ে আজকের মতো। আল্লাহ হাফিজ। ■

মনোযোগ পরীক্ষা

মু. তৌহিদুল ইসলাম



উপকরণ : টেনিস বল
ধরন : একক

এই খেলাটি মনোযোগ, সতর্কতা এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা বাড়ানোর জন্য একটি মজার ও শিক্ষণীয় খেলা। এটি দুইজন নিয়ে খেলা যাবে। প্রথমে দুইজন মুখোমুখি দাঁড়াবে। প্রথম সদস্য তার দুই হাতের তালুতে একটি করে টেনিস বল রাখবে, আর দ্বিতীয় সদস্য তার দুই হাত প্রথম সদস্যের হাতের ওপর হালকা করে রাখবে।

পরিচালক যখন খেলা শুরুর সংকেত দেবে, তখন প্রথম সদস্য হঠাৎ করে এক বা দুইটি বল ছেড়ে দেবে। দ্বিতীয় সদস্য খুব দ্রুত সেই বল ধরার চেষ্টা করতে হবে। যদি সে বল ধরতে পারে, তাহলে একটি পয়েন্ট পাবে; আর না পারলে কোনো পয়েন্ট পাবে না। এভাবে কয়েক রাউন্ড খেলা চলতে থাকবে, এবং শেষে যে সদস্য বেশি পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারবে, তাকেই বিজয়ী ঘোষণা করা হবে।

খেলাটি শুধু আনন্দদায়ক নয়, বরং মনোযোগ ধরে রাখা, লক্ষ্য ঠিক করা এবং মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধিতেও সহায়ক। ■

হাবা মোহন

গল্প : ফরহাদ লিমন
আঁকা : ত্রিদীপ বড়ুয়া




সাঁতার প্রতিযোগিতা শুরু হলো
মোহন, ভাইসা থাকনের খেলা না, সাঁতার দে বাপ। আগে যা...
মোরগ লড়াই প্রতিযোগিতা শুরু
কোক্ কোকোক্ কোক্
লাঠি খেলা প্রতিযোগিতায়...
আব্বা, কেডা কী চুরি করছে? সবাই লাঠি দিয়া বাইরাইতে চায় ক্যান?
সাঁতারে চ্যাম্পিয়ন নজল মিয়া
সবাই হাততালি দেন।
নাইমা আয় বাপ, মন খারাপ করিস না। সবাই কি আর সোনার মেডেল পায় ? ডিম দিয়া ভাত খাবি, আয়।
সোনার মেডেল পাস নাই তো কী হইসে? সোনা মিয়ার ইসপেশাল মুড়িভাজা নিয়া আসছি তোর জন্য।
প্যাকেট গলায় ঝুলায়া সবাইরে দেখাই?
সমাপ্ত

রাশিয়ার গল্প



পিঁপড়ের বাড়ি ফেরা

মূল : ভিতালি বিয়ানকি
রূপান্তর : রিয়াজ মোরশেদ সায়েম

একদিন এক ছোট্ট পিঁপড়ে তালগাছের মাথায় উঠল। গাছের ডালে শুকনো পাতার ওপর বসে বলল, আহা! একটু বিশ্রাম নিই। তারপর নেমে যাব।

পিঁপড়েদের নিয়মনীতি খুবই কড়া। সূর্য ডুবে গেলে সবাইকে বাসায় ফিরে যেতে হয়। কেউ দেরি করলে তাকে রাতটা বাইরে কাটাতে হয়। পিঁপড়েটা ভাবল, সময় অনেক বাকি আছে। নামতে আর এত সময় লাগবে না। আরেকটু বসি। হাওয়া খাই।

ঠিক তখনই একটা ঝোড়ো হাওয়া শুকনো পাতাটাকে ডাল থেকে ছিঁড়ে নিয়ে গেল। পিঁপড়ে শক্ত করে ধরে রইল। বাতাস তাকে নিয়ে গিয়ে মাঠের ওপর ফেলল। পড়তেই তার পায়ে খুব ব্যথা পেল।

পিঁপড়ে দুঃখ করে বলল, এবার আমি বাড়ি যেতে পারব না। যদি পায়ে ব্যথা না পেতাম, তাহলে এক দৌড়ে চলে যেতাম!

ঠিক তখন সে দেখল, একটা কেঁচোপোকা হাঁটছে। পিঁপড়ে বলল, ভাই, আমায় বাড়ি নিয়ে যাবে? আমি পায়ে ব্যথা পেয়েছি। হাঁটতে পারছি না। কেঁচোপোকা বলল, আচ্ছা, চড়ে বসো।

পিঁপড়ে তার পিঠে উঠল। কেঁচোপোকা দুলে দুলে অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাঁটতে লাগল। একবার মাথা নিচে, আরেকবার পা ওপরে। পিঁপড়ে বারবার উল্টে যাচ্ছিল। শেষে বিরক্ত হয়ে চিৎকার করে বলল, থামো, না হলে আমি কামড় দেবো! কেঁচোপোকা থেমে গেল। পিঁপড়ে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল।

মাঠে তাকিয়ে সে দেখল একটা মাকড়সা হেঁটে যাচ্ছে। পিঁপড়ে বলল, স্পাইডার ভাই, আমাকে একটু নিয়ে যাবে? আমার পায়ে বড্ড ব্যথা। স্পাইডার বলল, আচ্ছা, ওঠো।

পিঁপড়ে তার পিঠে চড়ল। কিন্তু তার লম্বা পা-গুলো এদিক-ওদিক নড়ছিল শুধু। আগাতে পারছিল না তেমন। পিঁপড়ে খুবই বিরক্ত হলো। একটু পর স্পাইডার থেমে বলল, ওই দেখো, একটা গুবরেপোকা আসছে। ও আমার চেয়ে দ্রুত দৌড়ায়।

পিঁপড়ে গুবরেপোকার পিঠে উঠল। গুবরেপোকা ছুটতে লাগল। যেন সে উড়ছে। কিন্তু আলুখেতের কাছে এসে সে থেমে গেল। বলল, এত উঁচু-নিচু পথে আমি যেতে পারব না। তুমি অন্য কাউকে খুঁজে নাও।

হঠাৎ একটি ছোট্ট পোকা এসে বলল, এসো, তোমাকে আমি নিয়ে যাব। পিঁপড়ে অবাক হয়ে বলল, তুমি এত ছোট, আমাকে নিয়ে কীভাবে যাবে? ছোট্ট পোকাটা বলল, তুমি বসো, আমি দেখাই।

সে চমৎকার লাফ দিয়ে দিয়ে একের পর এক আলুর সারি পেরিয়ে গেল। কিন্তু বেড়া টপকাতে পারল না। তখন তারা ঘাসফড়িংকে ডাকল।

ঘাসফড়িং বলল, চড়ে বসো। সে লাফ দিয়ে উঁচু বেড়া পার হয়ে গেল। তারপর বলল, এবার নেমে যাও, আমি এর বেশি যাব না।

পিঁপড়ে দেখল সামনে একটা নদী। সে কাঁদতে কাঁদতে বলল, এ নদী আমি কীভাবে পার হব? ঘাসফড়িং বলল, অপেক্ষা করো, জলতেলাপোকা আসবে।

শিগগিরই একটা জলতেলাপোকা ভেসে এলো। পিঁপড়ে তার পিঠে উঠল। সে বরফের মতো মসৃণ ভঙ্গিতে পানির ওপর দিয়ে ছুটল। সে তার শক্ত পা দিয়ে দ্রুত নদীর অপর পাড়ে চলে এলো। নদী পার হতেই বলল, এবার নামো। আমি কেবল পানিতে হাঁটতে পারি।

সূর্য তখন প্রায় ডুবে যাচ্ছিল। পিঁপড়ে ভয় পেল। হায় হায়, আমার তো অনেক দেরি হয়ে গেল।

এমন সময় একটা বড় মে-পোকা এলো। পিঁপড়ে তার মাথায় উঠে বসল। মে-পোকা তার শক্ত পিঠ খুলল। নরম ও স্বচ্ছ ডানা বের করে উড়তে লাগল। ভোঁ ভোঁ শব্দ করে সে আকাশে উঠে গেল। পিঁপড়ে দেখল, সূর্য তখন মাটি স্পর্শ করছে।

মে-পোকা গাছের কাছে এসে নেমে গেল। পিঁপড়ে ভয় পেল। আমি কীভাবে নামব? আমার পা ব্যথা। গলাও ভেঙে যেতে পারে!

মে-পোকা বলল, আমি তোমাকে নামাব না। তোমরা পিঁপড়েরা খুব কামড় দাও। নিজে নামো।

পিঁপড়ে দেখল কাছে শুঁয়োপোকা পাতায় সুতো কাটছে।
পিঁপড়ে বলল, দয়া করে আমাকে নামিয়ে দাও। না হলে রাতটা বাইরে কাটাতে হবে।

শুঁয়োপোকা বলল, আমি ব্যস্ত, বিরক্ত করো না।

পিঁপড়ে রেগে তাকে কামড় দিল। শুঁয়োপোকা অবাক হয়ে নিজেকে বলল, আহা! সে কুঁচকে লাফ দিয়ে পড়ল। কিন্তু পিঁপড়ে সুতোয় আঁকড়ে ধরে রইল। সে সুতো টেনে টেনে ধীরে ধীরে মাটিতে নেমে গেল।

এদিকে সব পিঁপড়ে নিজেদের ঘরে ঢুকে গেল। আর সূর্য ডুবে গেল। ছোট্ট পিঁপড়েটাও নিরাপদে নিজের ঘরে ঢুকল।

সে বেঁচে গেল! ■



টানাপোড়েন
রোহানী সাম্য

তিরতিরিয়ে ঘামছি আমি
শীতের চোটে কাঁপছি,
কী করা যায় এমন সময়?
গভীরভাবে ভাবছি।

কাঁথা গায়ে দেবো নাকি
লালরঙা ওই লেপটা?
চিন্তা মাথায় দিচ্ছে চাড়া
হচ্ছি চিড়েচ্যাপ্টা।

রাতের বেলায় পানি তো নয়
যেন বরফ টুকরা,
বেশ নাজেহাল ইদানিং সব
বুড়ো থেকে ছোকরা।

টানাপোড়েন গ্রীষ্ম-শীতের
আকুপাকু-আনচান,
সময়টার আজ বড্ড দেমাগ
হয়ে গেছে খানদান।

দশম শ্রেণি, জামালপুর জিলা স্কুল।

শিক্ষাঙ্গন
সুয়াইদাহ নাওশীন জারা

আমাদের প্রিয় শিক্ষাঙ্গন,
তোমার বুকে সারাদিন করি
হাসি-খেলার আলিঙ্গন।

পড়াশোনার ব্যস্ততাতে
কাটে সারা দিন
হৈ-হল্লা আর চঞ্চলতায়
বাজে খুশির বীণ।

মন দিয়ে ক্লাস করি
হয়ে আমি শান্ত,
দিন শেষে বাড়ি ফিরে
হয়ে যাই ক্লান্ত।

সপ্তম শ্রেণি,
উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা।

ডেঙ্গু মশা
কাশিফা কাইয়ুম তাইবা

দাদি বাড়ি মশার বাসা,
ডেঙ্গু মশার ছা!
রক্ত খায়, গুনগুনায়
তাইরে নাইরে না।
দেখবে যদি ডেঙ্গু মশা,
এসো তবে সবে।
মজা হবে, কামড় খাবে,
রক্ত চুষে নেবে!

তৃতীয় শ্রেণি,
সিরাতুল মুস্তাকীম ইসলামিক একাডেমি, ফরিদপুর।





নীলিমায় আকাশ
তাসফিয়া

দূর আকাশে সাদা সাদা মেঘ দেখেছো নাকি?
তার সম্মুখে উড়ে যাওয়া কালো কালো পাখি!
নীল রংয়ের আজ কেন যেন বেশিই বাড়াবাড়ি
শরৎ শরৎ মাস ঢুকেছে জানান দিচ্ছে তা কি?

বিকেল হতেই হলুদ রোদের মিষ্টি কড়া খেলা
সোনালু রোদ জানান দিচ্ছে এই ফুরলো বেলা!
আলো ছায়ার সমান্তরাল রেখা দালান তটে
হরেকরকম ভাবনা আনে তখন স্মৃতিপটে!

কী অনিন্দ্য সাঝ দিলে রব অবাক হবে দেখি!
সকাল দুপুর নীল, সাদা আর কমলা রং একি!
এই শহরে অবুঝ সবুজ পাওয়া খুবই ভারি
ভাগ্য ঐ আকাশ জানায় ঋতু কখন কী কী?

বাংলার বিকেল
মিহফাজ উদ্দিন আত তাসদিক

রামপুরাতে বিকেল মানে.
আটকে পড়া গাড়ি,
মতিঝিলের বিকেল মানে
অফিস শেষে বাড়ি।

পুরান ঢাকার বিকেল মানে
তেহারি-ডালপুরি,
হাতিরঝিলে বিকেল মানে,
সুখের ঘোরাঘুরি।

বেইলি রোডের বিকেল মানে
বিফ বার্গার-কোক,
রমনা পার্কের বিকেল মানে
হাঁটতে থাকা লোক।

শহর জুড়ে বিকেল মানে
ব্যস্ত দোকান পাট,
শিশুর কাছে বিকেল মানে,
একটি খেলার মাঠ।



শিশুকিশোর মাসিক ফুলকুঁড়ির ৪০৯তম সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত

'ফুলকুঁড়িতে লিখি, লেখালেখি শিখি' স্লোগানকে সামনে রেখে গত ২১ নভেম্বর, শুক্রবার বাংলাদেশ শিশুকল্যাণ পরিষদ মিলনায়তনে শিশুকিশোর মাসিক ফুলকুঁড়ির আয়োজনে ৪০৯তম সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাসিক ফুলকুঁড়ির সহ-সম্পাদক আরিব মাহমুদের সঞ্চালনায় সাহিত্য সভায় সভাপতিত্ব করেন মাসিক ফুলকুঁড়ির সম্পাদক বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক আহমদ মতিউর রহমান। পঠিত লেখাসমূহের ওপর আলোচনা করেন মাসিক ফুলকুঁড়ির নির্বাহী সম্পাদক নাঈম আল ইসলাম মাহিন। সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি মুর্শিদ-উল-আলম। আরও উপস্থিত ছিলেন মাসিক ফুলকুঁড়ির প্রাক্তন সহ-সম্পাদক আশিকুজ্জামান সুরুজ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করে ফুলকুঁড়ি বন্ধু ছামিম আল হাসান। এরপর সঙ্গীত পরিবেশন করে মো. বিল্লাল হোসেন। এরপর শুরু হয় লেখা পাঠ পর্ব। এ পর্বে লেখা পাঠ করেন নাসীমুল বারী, ছোটদের সময়ের সম্পাদক মামুন সারওয়ার, সুমন রায়হান, মিজানুর রহমান জামীল, আবুল খায়ের নাঈমুদ্দীন, বজলুর রহমান, মো. নুরুল হক, সরদার আব্বাস উদ্দিন, শাওন শাহরিয়ার, মো. শামীম হোসাইন, মো. নাজিম উদ্দিন, তানভীর তালহা, হাসনা হেনা, অনন্ত রিয়াজ, ফারুক প্রধান, নাজমুল হোসাইন খান, তৌহিদুল ইসলাম কনক, আজাদী আবাবিল সায়মা, আজমির হোসেন, বায়েজিদ বোস্তামি, রাফি আহাম্মেদ, আব্দুল আলিম, মিনহাজ হোসেন, জিহাদ মণ্ডল, আব্দুল্লাহ আল সিয়াম, ত্বোহা আব্দুল্লাহ, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মারওয়ান, ফাইয়াজ আল আফিফ, মাহমুদ আল মুহিত সাওম, হাদীউল উমাম এবং অগ্রপথিক আব্দুল মোক্তাদির রাইয়ান। লেখাপাঠের ফাঁকে যৌথ সঙ্গীত পরিবেশন করে দুইবোন সৈয়দা উমায়রা নাওয়ার ও সৈয়দা রুফাইদা রাওয়াহা।

অনুষ্ঠান বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন মোজাম্মেল হক ও নাঈম সরকার। বিশেষ সহযোগিতায় ছিলো ফ্লোরাল হাউজ, উত্তরা।
শিশুকিশোরদের প্রাণবন্ত উপস্থিতি ও অংশগ্রহণে সাহিত্য সভাটি ছিল আনন্দমুখর।

কৃষ্ণচূড়া আসর

সাকিব আল হাসান ওয়াফি : ফুলকুঁড়ি আসর অরুণোদয় শাখার কৃষ্ণচূড়া আসরের আসর অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। আসরের সহকারী পরিচালক সোহাইল হক তাইমি'র উপস্থাপনায় এবং আসর পরিচালক সাকিব আল হাসান ওয়াফির পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফুলকুঁড়ি আসরের কেন্দ্রীয় সাহিত্য সম্পাদক আরিব মাহমুদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শাখার সহকারী পরিচালক আসিফ ইকবাল আকাশ। অনুষ্ঠানে সবার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও হাসিখুশি উপস্থিতিতে পুরো অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত ও আনন্দমুখর।



শাপলাকুঁড়ি আসর

অগ্রপথিক আফিফ ফারাবি : ফুলকুঁড়ি আসর সিলেট মহানগরীর শাপলাকুঁড়ি আসরের উদ্যোগে চড়ুইভাতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
আসর পরিচালক অগ্রপথিক আফিফ ফারাবি হক এর পরিচালনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত ফ্লাইট সার্জেন্ট মোহাম্মদ মুক্তার হোসেন ও এডভোকেট সোহেল আহমদ।
অনুষ্ঠানে ফুলকুঁড়ি গেমসসহ নানা মজার খেলার আয়োজন করা হয়। খেলায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে থেকে বিজয়ীদেরকে পুরস্কৃত করার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়।



আম্রকুঁড়ি আসর

অগ্রপথিক আল মাহদী হাসান : ফুলকুঁড়ি আসর চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহর শাখার আম্রকুঁড়ি আসরে ৫১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে সাইকেল র‌্যালি আয়োজিত হয়। আসর পরিচালক অগ্রপথিক আল মাহদী হাসানের পরিচালনায় র‌্যালিটি চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান প্রদক্ষিণ করে স্লো সাইকেল রেস প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শেষ হয়। র‌্যালিতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফুলকুঁড়ি ইসলামিক একাডেমির সহকারী প্রধান শিক্ষক মো. মুখলেসুর রহমান এবং শাখা পরিচালক খালিদ হাসান।



সূর্যমুখী আসর

মো. আরাফাত রহমান : ফুলকুঁড়ি আসর সবুজমেলা শাখার সূর্যমুখী আসরের আয়োজনে আসর অনুষ্ঠান ও বিজ্ঞান কুইজ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আসর পরিচালক মো. আরাফাত রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাহিত্য সম্পাদক আরিব মাহমুদ। আরও উপস্থিত ছিলেন শাখার পরিচালক ও সহকারী পরিচালক।

অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান কুইজ প্রতিযোগিতা, গান, কবিতা আবৃত্তি, অভিনয়ে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে ৯ জন বিজয়ীর হাতে অতিথি পুরস্কার তুলে দেন।



রক্তজবা ও বেলীফুল আসর

মুয়াজ ইবনে মহসিন : ফুলকুঁড়ি আসর ঢাকা মহানগরী শতদল শাখার সুবর্ণ অঞ্চলের রক্তজবা ও বেলীফুল আসর কর্তৃক অনুষ্ঠিত হলো আন্তঃআসর প্রীতি ফুটবল ও ক্রিকেট ম্যাচ এবং এসো সাঁতার শিখি কর্মসূচি।

রক্তজবা আসরের খেলাধুলা ও ব্যায়াম সম্পাদক মুয়াজ ইবনে মহসিনের ব্যবস্থাপনায় আয়োজনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শাখা সিএসডি সম্পাদক সৈকত সরকার এবং কৃষি-শিল্প-বিজ্ঞান সম্পাদক ত্বোহা আব্দুল্লাহ।



কৃষ্ণচূড়া আসর

আল-রাদি: 'সুস্থ সবল ফুলকুঁড়ি,
দেশের সেবায় নেই জুড়ি'

ফুলকুঁড়ি আসর সিরাজগঞ্জ শহর শাখার কৃষ্ণচূড়া আসরে ৫১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট এর আয়োজন করা হয়।

আসর সহকারী পরিচালক আল-সাফির ব্যবস্থাপনায় এবং আসর পরিচালক আল-রাদির পরিচালনায় ৮টি টিমের অংশগ্রহণে উক্ত টুর্নামেন্টটি চমৎকারভাবে শেষ হয়। টুর্নামেন্ট এ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শাখা পরিচালক আলাউদ্দিন রাজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন শাখার অফিস সম্পাদক আবু রায়হান।



গোলাপকুঁড়ি আসর

আব্দুল্লাহ মাহাদী মুঈন : গাছ লাগিয়ে সবুজ গড়ি,
ফল ফসলে স্বদেশ ভরি।

ফুলকুঁড়ি আসর বেরোবি (প্রস্তাবিত) শাখার গোলাপকুঁড়ি আসরের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়।

আসর পরিচালক আব্দুল্লাহ মাহাদী মুঈনের পরিচালনায় উক্ত কর্মসূচিতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কর্মিপরিষদ সদস্য ও রংপুর মহানগরীর পরিচালক বদিউজ্জামান সাদিক, বেরোবি শাখার পরিচালক মেহেদী হাসান সিয়াম।



একটু হাসো



দুই ভিক্ষুক এর মধ্যে কথোপকথন:-
১ম ভিক্ষুক : জানো, গতকাল আমি ১০০ টাকা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।
২য় ভিক্ষুক : সেটা দিয়ে কী করেছ?
১ম ভিক্ষুক : ফেলে দিয়েছি।
২য় ভিক্ষুক : কেন ফেলে দিয়েছ?
১ম ভিক্ষুক : নোটটি নকল ছিল।
২য় ভিক্ষুক : কী করে বুঝলে?
১ম ভিক্ষুক : ১০০ টাকার নোটে কখনো তিনটি শূন্য দেখেছ?

সংগ্রহে : ওমর ফাহাদ
তৃতীয় শ্রেণি, ভোলা সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়।

ঘাটে বাঁধা থাকা অচেনা কারো নৌকা নিয়ে নদীতে ঘুরতে গেল দুই বন্ধু। মাঝনদীতে আসার পর-
প্রথম বন্ধু : এই দেখছিস, নৌকা ফুটো হয়ে পানি উঠছে।
দ্বিতীয় বন্ধু : তাতে কী হয়েছে?
প্রথম বন্ধু : পানি উঠে নৌকা ডুবে যাবে তো..!
দ্বিতীয় বন্ধু : তাতে কী? নৌকাটা তো আর আমাদের না।

সংগ্রহে : রহিম ইসলাম আরাফ
আল আমিন একাডেম স্কুল অ্যান্ড কলেজ, চাঁদপুর।



বাবা ও ছেলের মধ্যে কথোপকথন :

বাবা : রাতুল তুই এবারও পরীক্ষায় ফেল করেছিস?
রাতুল : জি, আব্বা।
বাবা : কিন্তু, তুই তো বলেছিলি সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিস?
রাতুল : হ্যাঁ আব্বা।
বাবা : তাহলে ফেল করলি কীভাবে?
রাতুল : আব্বা, সব প্রশ্নের উত্তর তো দিছি কিন্তু উত্তরগুলো ভুল হইছে।

সংগ্রহে : সাজিদ হাসান
নবম শ্রেণি, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ রংপুর।



জাদুঘরে বেড়াতে গিয়ে বেখেয়ালে একটা চেয়ার ভেঙে ফেলল পল্টু। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল জাদুঘরের কর্মচারী। বলল, 'আরে করেছেন কী? জানেন, এই চেয়ারটা ৪০০ বছরের পুরোনো!'
পল্টু হেসে বলল, 'যাক, বাঁচালেন। আমি তো ভেবেছিলাম নতুন চেয়ার!

সংগ্রহে : মুহাম্মদ তমিজুল হক রিপন





রিনির সঙ্গী-সাথি

নাদিয়া তারান্নুম

টানা পাঁচ দিন বৃষ্টির পর আজ কড়া রোদ উঠেছে। ছোট্ট রিনি গালে হাত দিয়ে ছাদের দোলনায় বসে বসে চিন্তা করছে কেন তার কোনো বন্ধু নেই, কেন তাকে সবসময় একা একা সময় কাটাতে হয়। শুধু পড়াশুনা করতে রিনির একদম ভালো লাগে না। রিনি চায়, ওর কতগুলো গুড়ো গুড়ো বান্ধবী থাকবে, যাদের সাথে ও ক্লাস শেষে ফুচকা খাবে আর গল্প করতে করতে

বাসায় আসবে। যে কি না ওর যত কথা আছে পেটে সব শুনবে বসে বসে আর খিলখিল করে হাসবে দুজনে। কিন্তু ওর ছোট বিড়ালটা ছাড়া তো কেউ ওর কথা বুঝতে পারে না। তাই বেশির ভাগ সময় ও একা একা ছাদের দোলনায় বসে বসে আকাশ দেখে। ওর খোলা আকাশে কবুতরের ঝাঁক উড়তে দেখতে এত্ত আনন্দ লাগে! ওর খুব মন চায় খোলা আকাশে উড়তে। ও চায়, কবুতররা যেমন এক ঝাঁক মিলে একসাথে উড়ে বেড়ায়, ও তেমন কিছু সঙ্গী সাথি নিয়ে উড়ে বেড়াবে। ও মাঝে মাঝে কবুতরের সঙ্গে ভাব করার চেষ্টা করে, যাতে ওরা ওকে কোনোভাবে সঙ্গে নিয়ে যায়, 'আমায় নিবা তোমাদের সাথে, কবুতর? তোমার তো অনেক সঙ্গী আছে। কিন্তু জানো? আমি খুব একা, আমার সাথে কেও কথা বলে না। তুমি কি আমার কথা বুঝতে পার, কবুতর?' কিন্তু দুঃখজনক কবুতরও রিনির কথা বুঝতে পারে না, ওরাও ওদের গ্রুপের ওকে জায়গা দিল না। এটা রিনিদের নিজেদের বাড়ি। দশ তালা বিল্ডিং ওর বাপ-চাচারা মিলে বানিয়েছে বছরখানেক আগে। কিন্তু বাসায় এত এত মানুষ থাকা সত্ত্বেও রিনির সাথে কথা বলার মতো কেউ নেই। এই নিয়ে ওর খুব মন খারাপ হয় মাঝে মাঝে। তার উপর ঘরের ভিতর ঝগড়া-অশান্তি লেগেই থাকে। ও বুঝতে পারে যে এই সব অশান্তির মূল ও নিজেই। ওকে নিয়েই সবার চিন্তা পেরেশানি। সব কিছু মিলিয়ে আজকে রিনির মাথাটা আর কাজ করতেছে না। দুই ফোঁটা চোখের পানি গড়িয়ে পড়তেই রিনি উঠে দাঁড়াল, জোরে নিঃশ্বাস ফেললো, তারপর এক দুই কদম করে সামনে এগোতে থাকে। ঠিক কিনারে আসার পর কেনো যেন ওর বুক ধড়ফর করতে লাগলো, আর চোখের পানি অনবরত পড়তে লাগলো। ও নিচে তাকিয়ে খেয়াল করলো, ওর চোখের পানি গাল দিয়ে গড়িয়ে একদম নিচে চলে যাওয়ার সময় মাঝ পথে যেন উধাও হয়ে যায়। ওর খুব মন চাচ্ছিল ও এরকম উধাও হয়ে যাবে দুনিয়া থেকে, যেন আর কেউ ওর দেখা না পায় কোনো দিন। রিনি শেষ কদমটা ফেলার পর ওর পায়ের নিচে আর মাটি নেই। কিন্তু, ওর কাছে আশ্চর্য লাগছে যে ও নিচের দিকে না গিয়ে উপরের দিকে কেন যাচ্ছে? রিনি চমকে গেল এইটা বুঝতে পেরে যে ও উড়ছে। ও বিশ্বাস করতে পারছিলো না যে ও আসলেই আকাশে উড়ছে। একটি বড় সাদা রংয়ের খুব সুন্দর কবুতর ওর উপর দিয়ে উড়ছে। পুরো স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। আকাশ একদম পরিষ্কার, নীল হয়ে আছে। মেঘগুলো একদম যেনো রিনি আসার সুবাদে টুকরো টুকরো তুলার মতো ছড়িয়ে আছে। আর রোদের আলো মেঘের মাঝখান দিয়ে উঁকি দিচ্ছে যেন রিনির সামনে আসতে লজ্জা পাচ্ছে। 'তোমাকে অনেক অনেক Thank you, কবুতর। তুমি আমার আকাশে উড়ার ইচ্ছা পূরণ করে দিয়েছো। কবুতর বলে উঠলো, 'আজকে তোমার সব ইচ্ছা পূরণ হবে, রিনি।' ওয়াও, তুমি আমার কথা বুঝতে পারো?' আনন্দে রিনির চোখে পানি এসে গেল। 'কিন্তু একটা প্রমিজ করতে হবে। তুমি কোনোদিনও আজকের মতো ছাদ থেকে লাফ দেওয়ার চেষ্টা করবা না। তাহলে তোমার সব ইচ্ছা পূরণ করবো।' 'ঠিক আছে, প্রমিজ এমনটা করবো না আর কখনো।' তারপর কবুতরটি রিনিকে একদম উপরে নিয়ে গেল ওদের ঝাঁকের মাঝে। সবাই রিনিকে দেখে খুশি হলো, রিনি ওদের সাথে খুব মজা করে আকাশে উড়লো। সন্ধ্যা হয়ে যেতে লাগলে, রিনি বললো, 'সন্ধ্যা হয়ে গেলে আমি কোথায় যাব? আমাকে please তোমাদের সাথে মজা করতে দাও আরো কিছুক্ষণ?' কবুতর বললো, 'ঠিকাছে তুমি এখন বলো কোথায় যেতে চাও?' 'সমুদ্রের পাড়ে বসে sunset দেখতে চাই।' কবুতরের ঝাঁক রিনিকে নিয়ে চলে এলো সমুদ্রের পাড়ে। রিনি বালুতে নেমে বসলো। পানির সা-সা আওয়াজ শুনে রিনির মনে হলো যেন সমুদ্র ওর সাথে খুব মজার গল্প করছে। রিনিও ওর পেটের সব গল্প বলে ফেললো সমুদ্রকে। পানির ফেনাগুলো যেন এই আসে রিনিকে ধরতে, আবার দৌড়ে চলে যায়, খুব মজা করে খেলছে রিনির সাথে। আর সূর্য ডুবে যাওয়ার আগ দিয়ে এমন সুন্দর দৃশ্য তৈরি হয়, আকাশে, পুরো কমলা, হলুদ আর pinkish type হয়ে যায়। এই ৩টি কালারই রিনির প্রিয় কালার। সূর্য যেন রিনিকে welcome করছে ওর প্রিয় কালার দিয়ে এত সুন্দর দৃশ্য বানিয়ে। আর ঠান্ডা বাতাস যেন রিনিকে জড়িয়ে ধরে বলছে, 'তোমার সাথে আমরা সবাই আছি, তুমি একা না।' তারপর সূর্য ডুবে গিয়ে আকাশ অন্ধকার হতে লাগলে, রিনির আবার মন খারাপ হয়ে যায়। রিনি বলে, 'এখন রাত হয়ে গেলে তো সব মজা শেষ। এখন কী হবে। আমি তো আরো আনন্দ করতে চাচ্ছি।' তখন কবুতর বললো, 'সূর্য ডুবে গেছে তো কী হয়েছে? তোমাকে Welcome করতে আরো সুন্দর জিনিস আসবে। তুমি একদম মন খারাপ করো না।' কিছুক্ষণ পর রিনি দেখলো, সূর্য পুরোপুরি ডুবে গিয়েছে। এখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। রিনির ভয় লাগতে শুরু করলো। কিন্তু ঠিক এমন সময় রিনি দেখতে পেল এত্ত সুন্দর একটা Crescent shaped Moon। চাঁদটা যেন মনে হয় রিনিকে খুশি করার জন্য haircut করে এসেছে। রিনি খুশিতে নাচতে লাগলো। তারপর দেখতে পেল আকাশটা ছোট ছোট তারা দিয়ে পুরো বিয়ে বাড়ির মতো সেজে আছে। এমন সময় নামলো বৃষ্টি। রিনি তো খুব মজা করে বৃষ্টিতে ভিজলো। আর চাঁদের দিকে মুখ করে অনেক জোরে হাসি দিলো, চাঁদও যেন ওর দিকে হাসি দিল আর ওর চেহারা চাঁদের আলো মেখে পুরো moon fairy লাগছিল। রিনির মনের একাকীত্ব দূর হলো কিছুটা। কবুতর বললো, 'রিনি, এখন তো তুমি একা নও। আমরা সবাই আছি তোমার সাথে। এখনও কি তুমি দুনিয়া থেকে গায়েব হয়ে যেতে চাও?' 'না, এখন আর চাই না। কিন্তু তোমরা সবসময় আমার সাথি হয়ে থাকবে তো?' কবুতর, চাঁদ, সমুদ্র, তারা, বৃষ্টি সবাই মিলে রিনি'কে বললো, 'যতদিন তুমি দুনিয়াতে আছো আমাদের সবাইকে পাবে। সময় করে মাঝে মাঝে আমাদের সাথে খেলতে আসবে, দেখবে কত্ত মজা লাগে!'

২০২৫ সালে অগ্রপথিক হয়েছে যারা



নাম : মো. তাওসীফ মাহমুদ
ডাকনাম : তাওসীফ
শাখা : চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহর
আসর : দোলনচাঁপা
দায়িত্ব : আসর পরিচালক
কী হতে চাই : ডাক্তার
কোড : ৫০৪



নাম : শাইখ আল মাহমুদ
ডাকনাম : শাইখ
শাখা : চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহর
আসর : পদ্মকুঁড়ি
দায়িত্ব : আসর পরিচালক
কী হতে চাই : আদর্শ শিক্ষক
কোড : ৫০৫



নাম : সিরাজুম মুনির সাদিক
ডাকনাম : সাদিক
শাখা : চট্টগ্রাম মহানগরী নীহারিকা
আসর : চন্দ্রমল্লিকা
দায়িত্ব : অঞ্চল সিএসডি সম্পাদক
কী হতে চাই : বিজ্ঞানী
কোড : ৫০৬



নাম : আব্দুল্লাহ আল জুহায়ের
ডাকনাম : জুহায়ের
শাখা : চট্টগ্রাম মহানগরী সাগরিকা
আসর : পানকৌড়ি
দায়িত্ব : আসর পরিচালক
কী হতে চাই : এ আই ইঞ্জিনিয়ার
কোড : ৫০৭

* অগ্রপথিক ফুলকুঁড়ি মানেই একজন আদর্শ ফুলকুঁড়ি। একজন ফুলকুঁড়ি সদস্যকে তার জ্ঞান, যোগ্যতা, উদারতা, ব্যবহার, আনুগত্য, নিষ্ঠা, আসর পরিচালনার দক্ষতা এবং ফুলকুঁড়িতে তার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ **'অগ্রপথিক ব্যাজ'** প্রদান করা হয়। অগ্রপথিক ফুলকুঁড়ি জ্ঞানে, মেধায় ও কর্মে ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপনের অধিকারী এবং সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফুলকুঁড়ির কর্মসূচি বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

সেরা ফটোগ্রাফ



অগ্রপথিক মো. তানভীর ফেরদৌস
নবম শ্রেণি, সিরোইল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী।





বন্ধুরা, তোমাদের অনেকেই ফটোগ্রাফি করতে পছন্দ করো। আবার অনেকেই চমৎকার ফটোগ্রাফি করতেও পারো। হ্যাঁ, তোমার তোলা সেরা ছবিগুলোর সাথে অবশ্যই তোমার নাম, শ্রেণি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর ও ডিভাইসের নামসহ monthlyphulkuri@gmail.com ইমেইলে পাঠিয়ে দাও। তোমাদের পাঠানো ফটোগ্রাফগুলোর মধ্যে প্রতি মাসে সেরা ফটোগ্রাফটি প্রকাশ করা হবে তোমাদের প্রিয় মাসিক ফুলকুঁড়িতে।

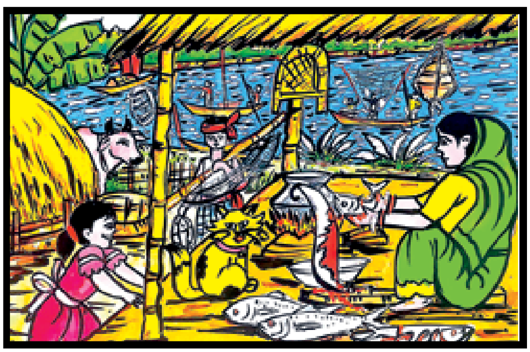
খুদে শিল্পীদের আঁকা ছবি



মো. সামিন ইয়াসার চৌধুরী
সপ্তম শ্রেণি, প্যারামাউন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রাজশাহী।



জিসান সাবরিনা আলম নুর
সপ্তম শ্রেণি, কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল স্কুল।



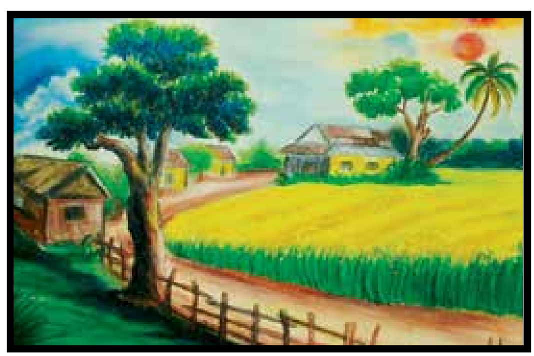
মেহরিমা নাওমী
দ্বিতীয় শ্রেণি, শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা।



বখতিয়ার হাসান খান
ষষ্ঠ শ্রেণি, মানারাত ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।



মো. মুস্তানছির ইসবাত রাহী
সপ্তম শ্রেণি, ফাকল পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, লালমনিরহাট।



অংকন বীর পাল
সপ্তম শ্রেণি, ভিক্টোরিয়া হাইস্কুল, সিরাজগঞ্জ।

তোমার আঁকা ছবি, নিজের ফটো, নাম, ঠিকানা, শ্রেণি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মোবাইল নাম্বার উল্লেখ করে পাঠিয়ে দাও monthlyphulkuri@gmail.com এই ঠিকানায়।

আসর অ্যালবাম



শিশুকিশোর মাসিক ফুলকুঁড়ির ৪০৯তম সাহিত্য সভায় উপস্থিতির একাংশ।



ঢাকা মহানগরী কিশলয় শাখার শিশুকিশোর সমাবেশে উপস্থিত ফুলকুঁড়ি আসরের উপদেষ্টা সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত) জয়নুল আবেদীন আজাদ।



খুলনা মহানগরীর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) মো. হুসাইন শওকত।



যশোর শহর শাখার শিশু সমাবেশ ও বিচিত্রা অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাননীয় জেলা প্রশাসক মো. আজাহারুল ইসলাম।



বান্দরবান শাখার শিশুকিশোর সমাবেশে উপস্থিত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আবু তালেব।



ঠাকুরগাঁও শাখার শিশুকিশোর ও অভিভাবক সমাবেশে উপস্থিত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. নাজমুল হক সুমন।



নরসিংদী শাখার শিশুকিশোর সমাবেশে উপস্থিত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা) মো. মনোয়ার হোসেন।



রংপুর মহানগরীর শিশুকিশোর সমাবেশে উপস্থিত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন) জনাব সুশান্ত চন্দ্র রায়।